জুলাই-সেপ্টেম্বর 1997

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

ঊনবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা | দাম পাঁচ টাকা

বিজ্ঞান আর বস্তুজগতের বিচারে নানা মনের নানান মত

অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রাম নয় শুধু, সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রক্রিয়াও সমান সচল

নিরাজ সমাজের স্বপ্ন দেখানো মানুষ—
পিটার ক্রুপটকিনের জীবন ও তাঁর রচনা

"দেবতার ব্যাধি" নিয়ে সমালোচনা ও লেখকের উত্তর

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

বর্ষ 19 সংখ্যা 3
জুলাই-সেপ্টেম্বর 1997

সূচিপত্র

আমাদের কথা ... 1

যত মন তত মত ... 3

বিপ্লবকে হারালাম আমরা ... 5

অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম ... 6

পিটার আলেকজান্ডার ক্রুপটকিন ... 9

পারস্পরিক সহায়তা—
বিবর্তনের একটি উপাদান ... 13

গণবিজ্ঞান আন্দোলন :
একটি আঞ্চলিক উদ্যোগ ... 17

মতামত

প্রসঙ্গ : "দেবতার ব্যাধি" ... 19

সমালোচনার উত্তর ... 21

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী
P 252, লেকটাউন, ব্লক A
কলকাতা 700 089

আমাদের কথা

প্রাণী জগতের বিবর্তনের নিয়ম নিয়ে ডারউইনের *Origin of Species* বইটি প্রকাশিত হয় 1859 সালে দীর্ঘ বিশ বৎসর গবেষণার অন্তে। বিবর্তনের নিয়ম আজ ডারউইন তত্ত্ব হিসেবেই খ্যাত। যদিও তাঁর নামের সাথে ওয়ালেসের নামটি যুক্ত হলে আরো ভালো হতো।

এই বই প্রকাশের পর বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয় নানান মহলে। তবে তৎকালীন ইওরোপের ধনী ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতি তথা উঠতি সামাজিক শক্তির কাছে আদৃত হয় এই তত্ত্ব। 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম'-এর ম্যালথাস তত্ত্বটি ইতিমধ্যেই পরিচিত ছিল ওয়াকিবহাল মহলে। ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর এই তত্ত্ব প্রাকৃতিক নিয়মের মান্যতা পেল। এক শ্রেণীর সমাজতাত্ত্বিক মানুষের সমাজের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করলেন। এঁরা বললেন যে, পশুদের মতো মানুষকেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়েছে। এটা প্রকৃতিরই নিয়ম। এ লড়াইতে সব থেকে যোগ্য ব্যক্তি যে, সেই পারে টিকে থাকতে। হঠে যেতে হয় দুর্বলদের। যেমন পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে গেছে বহু প্রজাতির প্রাণী।

অভিজাত সম্প্রদায় এবং ব্যবসায়ী শিল্পপতিরাও এই লড়াই-তত্ত্বকে ব্যবহার করলেন মজুরদের শোষণ এবং ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করার সপক্ষে যুক্তি হিসেবে। কালক্রমে এই লড়াই-তত্ত্ব গোটা পশ্চিমী সমাজের আদর্শ হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গক্রমে কার্লস মার্কসের 'শ্রেণী সংগ্রাম' তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর এই তত্ত্বও ডারউইনের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত। কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্‌তেহারের 1888 সালের সংস্করণে এঙ্গেল্‌স লিখিত মুখবন্ধে একথার উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি বলছেন যে — 'ডারউইনের মতবাদ জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা করেছে, আমার মতে এই সিদ্ধান্ত ইতিহাসের বেলায় তাই করতে

বাধ্য।' এই প্রসঙ্গে জানানো যেতে পারে যে ডারউইন একথা স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর 'অস্তিত্বের জন্য লড়াই'-এর সূত্রটি তিনি পেয়েছিলেন ম্যালথাসের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব থেকেই। মার্কস কিন্তু ম্যালথাস-তত্ত্বের সমালোচক ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে বহু লেখক-ই অস্তিত্বের জন্য প্রতিযোগিতা এবং লড়াই-এর এই তত্ত্বের সপক্ষে লেখনী ধরেছিলেন। সমাজজীবনে এর গুরুত্ব নিয়ে প্রচার চালাচ্ছিলেন। অন্যদিকে কিছু কিছু মানুষ কিন্তু প্রতিযোগিতার আড়ালের নিষ্ঠুর দিকগুলির কথা ভেবে বিচলিত বোধ করছিলেন। তাঁদের কাছে বড়ই একপেশে ঠেকছিল এই তত্ত্ব। আর ডারউইন নিজেও সেভাবে দেখতেন না বিষয়টি। সে কথা তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন সে-সময়।

আসলে ডারউইনের মতবাদের প্রচারকদেরই অবদান এটি। তাদের লেখাপত্রেই এই একপেশে ভাবটা প্রকট হচ্ছিল বেশি বেশি করে। এই অসংগতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন একজন। তাঁর নাম — পিটার ক্রপটকিন। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে অনুসন্ধান করে জীবজগতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার বহু দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেন। ক্রমশ তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শুধু প্রতিযোগিতাই নয় পাশাপাশি সহযোগিতার সহজাত প্রক্রিয়াটি যদি সচল না থাকত প্রকৃতিতে, তাহলে সম্ভব হতো না প্রাণীজগতের বিবর্তন। তাঁর সেই অনুসন্ধান ও উপলব্ধির ফলশ্রুতি *Mutual Aid – a Factor in Evolution* বইটি — 1902 সালে। খুবই সাড়া জাগিয়েছিল বইটি সে-সময়। আমাদের এখানেও বহুল প্রচারিত বইটি। তবে বহুল পঠিত নয় সম্ভবত।

এই প্রতিযোগিতার হাওয়া আমাদের গায়ে এসেও লেগেছে। বাজার আর মুনাফার দৌড়-ই জীবনের পরম সত্য এই বিশ্বাস আজ দানা বেঁধে উঠছে সকলের মধ্যে। মানুষ, মানুষের বেঁচে থাকার উপায় উপকরণ এই দৌড়ের অনুষঙ্গ-মাত্র। এই লড়াই-তত্ত্ব প্রাকৃতিক নিয়মের মান্যতা পেতে শুরু করেছে এখানেও। এমন একটি সময়ে পিটার ক্রপটকিনের বইটি 'অন্যরকম ভাবনা'র উৎস হতে পারে মনে করে স্মরণ করা হচ্ছে। এই সংখ্যায় ওই বইয়ের মুখবন্ধটির অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।

একই সাথে স্মরণীয় বোধহয় আরো একটি বই। *On Being Human* । লেখক অ্যাশ্‌লে মন্টাগু। তিনিও বইটি লিখেছিলেন মার্কিন তথা পশ্চিম দুনিয়ায় শিশু থেকে শুরু করে সমস্ত নাগরিকদের এই মুহূর্তে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি ও বাস্তব ক্ষেত্রে লড়াইয়ের চেহারা দেখে আতঙ্কিত হয়ে। এবং অবশ্যই পিটার ক্রপটকিনের বইটি-ই ছিল তাঁর অনুপ্রেরণা। ছোট্ট এই বইটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে এর প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্যটি সংক্ষেপে উদ্‌ধৃত করা হলো এই সংখ্যায়।

এই সুযোগে পিটার ক্রপটকিনের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতও সংযোজিত হলো। আসলে— মানবদরদী এই মানুষটির সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা হয় না আমাদের এখানে। যেটুকুও হয় তা খুব একটা সদর্থে নয়। কারণ মতাদর্শের দিক থেকে তিনি ছিলেন নৈরাষ্ট্রবাদী। ফলে এখানে দক্ষিণ কিংবা বাম সকল রাষ্ট্রবাদীদের কাছেই অপাংক্তেয় তিনি। যদিও অল্প মানুষ-ই জানেন নৈরাষ্ট্রবাদীদের বক্তব্য আসলে কী। এবং এটাও খুব অল্প লোকই জানেন যে, আজ বামপন্থী ভাবনার পথিকৃৎ বলে প্রচার পান যাঁরা, নৈরাষ্ট্রবাদীদের ভাবনার দ্বারা কতখানি প্রভাবিত তাঁরা এবং তাঁদের মতবাদ।

ভুল সংশোধন

বিজ্ঞান বিজ্ঞানকর্মী জানুয়ারি-জুন 1997 বর্ষ 19 সংখ্যা 1–2 সংখ্যার প্রথম প্রচ্ছদে চাপা হয়েছে 'দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা'। এই স্থলে পড়তে হবে প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে আমরা দুঃখিত। স.ম.

যত মন তত মত

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি'র নানান দিক নিয়ে সমালোচনা শোনা যায় প্রায়শই। এই সংক্রান্ত বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে বিওবি-র পাতাতেও। এদেশের বাস্তবতায় এই ধরণের সমালোচনা সময়োচিত কিনা তা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন লেখক এই প্রবন্ধে। এই ধরণের সমালোচনা পশ্চিমের ধনী দেশের ভাবনার অনুকরণ বলেই মনে করেন লেখক। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিতর্কের উর্ধ্বে নয় বোঝাই যাচ্ছে। এ নিয়ে পাঠকের মতামত জানতে এবং বিওবি-তে প্রকাশে আগ্রহী আমরা। *স. ম.*

যত দিন যাচ্ছে 'বিজ্ঞান' জ্ঞানতত্ত্বের ও তত্ত্ববিদ্যার বিষয় হিসাবে গভীরভাবে ভাবনাচিন্তার দাবি জানাচ্ছে। আমাদের এই বিকৃত অসম সমাজবিকাশের পারিপার্শ্বিকতায় যারা এই সব নিয়ে ভাবিত হচ্ছেন তারা বহুক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার। কেননা পাশ্চাত্যের চুঁইয়ে আসা পোস্ট মডার্নিজম, উইমেন কোশ্চেন, ইকোলজি ইত্যাদির মাধ্যমে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিজ্ঞান বিরোধিতার স্রোত যেন বেনোজলের মতো ঢুকে পড়ছে আমাদের এই—একদিকে মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্যদিকে পণ্যমোহবদ্ধ সমাজে। আমরা বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার আগেই বিজ্ঞান প্রযুক্তি হঠাও আন্দোলনে সামিল হতে চলেছি। তাই এখন বেশি বেশি করে দরকার বিজ্ঞানের মননশীলতার পেশীকে মজবুত করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া।

বিজ্ঞান কী?

খুব সরল করে বলতে গেলে আমাদের চারপাশের প্রকৃতির এই রহস্যময় জগতের নিয়মশৃঙ্খলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই বিজ্ঞান। মানুষ প্রজাতি হিসাবে এই গ্রহে সমাজগঠন করার পর দুটি প্রধান দিকে তার জ্ঞান-অন্বেষণ শুরু হয়েছে। এর একটি মানবচৈতন্য বা মন সম্পর্কে এবং অন্যটি বস্তু বা বিষয়গত জগৎ সম্পর্কে।

এই জ্ঞান অন্বেষণ করতে গিয়ে কয়েকটি জিনিস মানুষের উপলব্ধিতে এসেছে যার মধ্যে প্রধান হলো প্রকৃতির এই নিয়মশৃঙ্খলার সর্বজনীনতা অর্থাৎ সব দেশকালে সব সভ্যতায় প্রকৃতির বিষয়গত জগতের এই নিয়মশৃঙ্খলাগুলি সত্য। সেই সঙ্গে এই জ্ঞান-অন্বেষণ এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্ম দিয়েছে যা ঘটে যাওয়া পরীক্ষা নিরীক্ষার পরস্পর সংযুক্ত এবং একমুখী ছাঁদের। এই সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি (methodology) ছাড়া বিজ্ঞানের চর্চা অসম্ভব।

শুধুই নিয়মশৃঙ্খলা?

শুধু প্রকৃতির এই নিয়মশৃঙ্খলাগুলিকে জানার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের অনুসন্ধান শেষ হয়নি। মানুষ তার মনের মধ্যে এমন একটা ছাঁচের জন্য দায়ী যেখানে সে বেশিক্ষণ বিশৃঙ্খলা (chaos) সহ্য করতে পারে না। তাই সবকিছুর মধ্যে সে শৃঙ্খলা দেখতে চায়, এমনকী যেখানে সে নিজের চোখে বিশৃঙ্খলা দেখছে সেখানেও সে শৃঙ্খলা কল্পনা করে নেয় এবং তাই বিশ্বাস করে আশ্বস্ত থাকতে চায়। এরই ওপর ভিত্তি করে আদিম ও মধ্যযুগে বহুধরণের আজগুবি তত্ত্ব (অধিবিদ্যার জঞ্জাল) বিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানচর্চায় বাসা বেঁধেছিল। অন্যদিকে এই বিশৃঙ্খলা মানুষকে প্ররোচিত করেছে নির্মোহ নিস্পৃহ গবেষণায় যেখানে সে পরীক্ষাগারে পরীক্ষার বিষয়গুলিতে কোনো পক্ষ না নিয়ে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংশয়ী মনে পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি থেকে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছে। এই সংশয়ধর্মিতার জন্যই দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা বা মস্ত কিছুর সরল সাধারণীকরণ থেকে তাকে বিরত থাকতে হয়েছে। আবার সংশয়বাদ যেন এলোমেলো বিশৃঙ্খল না হয় তার জন্যেও তাকে পরবর্তীকালে সুসংবদ্ধ সংশয়ধর্মিতার বিকাশ ঘটাতে হয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু গভীর ভাবনার বিষয় হলো প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলা যত নিখুঁতভাবে গাণিতিক সূত্রের মধ্যে প্রকাশ করা হোক না কেন তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না বা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। কেউ কেউ বলছেন, এইসব বিজ্ঞানের সূত্রের কোনো দাম নেই এবং তা মেনে নেওয়াও যাবে না। অথচ বর্তমান কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কোনো কিছুর কারণ খুঁজে বের করার ব্যাপারে ন্যূনতমভাবে উৎসাহিত করে না—উলটে দেখা যায় সেগুলি গাণিতিক বর্ণনামাত্র। অন্যদিকে আধুনিক জীববিজ্ঞান,

শারীরবিদ্যা ও বিবর্তনবাদের মধ্যে প্রাণীদেহের জৈব অণু, কোষ ইত্যাদির সামগ্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কার্যকারণের মালা গেঁথে চলেছে। এইসব বিভিন্ন অবস্থান দেখে একথা বলা যায়, সব বিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে বিজ্ঞানের চর্চায় কার্যকারণ বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মতের মিল খুব কমই ঘটে। দেখা যায় আদিম ও মধ্যযুগের সমস্ত প্রকৃতি দার্শনিকেরা প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলার ও ঘটনার কার্যকারণের যে সব ব্যাখ্যা দিয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞানীরা তা প্রায় সবই নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আবার এও সত্যি যে, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সব বিজ্ঞানী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির এইসব নিয়মশৃঙ্খলায় ও তার কার্যকারণ ব্যাখ্যায় কোনো ঐশ্বরিক বা অতীন্দ্রিয় শক্তি বাস্তব ও প্রয়োজনীয়।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু

কিছুকাল আগে অব্দি এমনই মনে করা হতো যে, এই পার্থিব জগৎ ঈশ্বরের নিয়মশৃঙ্খলার অধীন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ঈশ্বর নিজেও এই শৃঙ্খলার অধীন এমন বিশ্বাস এখনও বহু বিজ্ঞানীর রয়েছে এবং তারা বলেন যে ঐ কারণে তাঁরা ঐ সব নিয়মশৃঙ্খলার কার্যকারণ অনুসন্ধানে উৎসাহিত হন। ঈশ্বরের জগতের নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি এই গভীর বিশ্বাস না থাকলে বহু বিজ্ঞানী মৌলিক বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত হতেন না এমন কথাও বলে থাকেন। উদাহরণ হিসাবে বলা হয় কেপলারের সূত্র, নিউটনের চরম দেশকালের ধারণা, আইনস্টাইনের কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিরোধিতা এসব কখনই সংশয়ী চিত্ত বিজ্ঞানীর মননশীলতা নয়—একপ্রকার বিশ্বাসের ফল। এইভাবে ধর্মের বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের বিশ্বাসকে গুলিয়ে ফেলা হয় বা হচ্ছে। এইখানে আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে। বিজ্ঞানেও একটা বিশ্বাস কাজ করে কিন্তু সে বিশ্বাস অন্ধ আনুগত্য বা যুক্তিহীন অসার আপ্তবাক্যকে মেনে চলা নয়। বিজ্ঞানের বিশ্বাস গড়ে উঠেছে কয়েক হাজার বছরের অসংখ্য অগণিত মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি পর্যবেক্ষণ বিবেচনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রামাণ্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। যার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে একটি সুস্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

যত দিন যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই বিশ্বনিখিলের নিয়মশৃঙ্খলা ও কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণে কোনো না কোনোভাবে কোনো মহাজাগতিক ঈশ্বরের (পরমসত্তা?) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিচালনার প্রসঙ্গটি বারবার এসে যাচ্ছে। আইনস্টাইনকেও একথা বলতে হয়েছিল—আশ্চর্য এটা নয়, যে মানব-প্রজাতি এই বিশ্বনিখিলকে উপলব্ধিতে আনতে চায়, আশ্চর্য এটাই যে এই মানবপ্রজাতি মনে করে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উপলব্ধিতে আনা সম্ভব।

বিজ্ঞান, জ্ঞানের উৎস?

দৈনন্দিন ব্যবহারিক প্রয়োজন বাদ দিলে বিজ্ঞান কী জ্ঞানের উৎস হতে পারে? বিজ্ঞানকে কী বলা যাবে সেই জ্ঞানের উৎস যেখানে প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলাগুলিকে অন্তত কিছু পরিমাণে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যাবে? এখানে মনে রাখতে হবে, প্রকৃতি আমাদের সংবেদনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞাত হয় যার মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, স্পর্শ প্রধানতম সংবেদনের মাধ্যম এবং মনের মধ্যে গিয়ে এই বাস্তব সংবেদনের কিছু পরিমাণে বিকৃত হবার সম্ভাবনা থাকছেই। সুতরাং যত নিখুঁত যন্ত্রপাতিই মানুষ আবিষ্কার করুক বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ এইসব উপাত্তগুলি চরমসত্য রূপে জ্ঞানের উৎস হিসাবে দেখা দেবে না; কিন্তু এরই মধ্যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে চলেছে এবং চলবেও। অর্থাৎ চৈতন্য নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব এবং বস্তুনিরপেক্ষ চৈতন্যের অস্তিত্ব—এই দুই প্যারাডাইমের লড়াই চলতেই থাকবে এবং এর সমঝোতাও হবে। কিন্তু প্রয়োজন এমন এক সর্বজনগ্রাহ্য মান্য বিচারদণ্ড যার দ্বারা আমাদের সমস্ত কাজকর্ম ও ভাবনাচিন্তাকে মেপে নিতে পারব।

যত মন তত মত

তাহলে দর্শন তথা বিজ্ঞানের দর্শনের অগ্রগতি যত ঘটবে তত বিজ্ঞানী বা দার্শনিকের মন প্রাধান্য পাবে? যত নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের দেখা মিলবে তত নতুন নতুন মত পাওয়া যাবে? হয়তো তাই, কিন্তু আমাদের অবিচল অতন্দ্র থাকতে হবে তথ্য সংগ্রহ ও তাকে বিচার করার পদ্ধতির ওপর, যাতে মনের বক্রতা প্রবেশ না করে। এতো গেল শুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার কথা। অন্যদিকে জ্যোতিষ, অলৌকিক পূর্বানুমান (Precognition), ভবিষ্যৎ গণনা (Chanelling), মানসিক শক্তিতে বস্তুচালনার ক্ষমতা (telekinesis) ইত্যাদি- এইসব আধুনিকতম বিচিত্র-'বিদ্যা'কে কোন্ গোত্রে ফেলা যায়? এও তো দেখা যাচ্ছে যে বহুক্ষেত্রে এরা আধুনিক মননচর্চার ফসল। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানস্রোতের মূল যে ধারা তার পাশাপাশি এরকম কতকগুলো ছোটো ছোটো ডোবা বা পুকুর রয়েছে। এদের অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এইসব বিদ্যাকে প্রমাণ করা যাবে কোন্ পদ্ধতি

দিয়ে? সে কি বিজ্ঞানের একমুখী ছাঁদের (পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত) পদ্ধতিতে না অন্য কোনো পদ্ধতিতে? অন্য কোনো পদ্ধতি হলে তা কি? বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পরস্পর সংযুক্ত এবং একমুখী ছাঁদটা আবিষ্কৃত হওয়ার পর আমাদের একটা মস্ত উপকার হয়েছে। আমরা সব কিছুকে ঐ পদ্ধতি দিয়ে যাচাই করতে পারি। তাই আমরা জানতে পেরেছি প্রকৃতিতে আত্মগত চিন্তার কোনো স্থান নেই—এগুলো নানা মনের নানা বিকৃত ফসল। এই পদ্ধতি সকলের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাই এই আলোচনার মূল বিষয় পদ্ধতি যা দিয়ে আমরা নানা মন নানা মত আর বস্তুজগৎকে বিচার করতে পারব। বিজ্ঞানকে জ্ঞানের উৎস হিসাবে বিবেচনা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি—এই প্রত্যয় সম্বল করে আমরা বিজ্ঞানদর্শনের গভীরতম সমস্যার মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারব। পাঁচ হাজার বছরের মানবসভ্যতার এই শ্রেষ্ঠ সম্পদ, বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি আমাদের নানা মনের নানা মতের মাঝখানে সংস্কৃতির মতো বিবেকের মতো আধিপত্য বিস্তার করুক।

বিপ্লবকে হারালাম আমরা

বহু বিপ্লব বিক্ষোভ আন্দোলনের সক্রিয় সাথী 'বিপ্লব'-এর যাত্রা শেষ হলো। মানুষের ভিড়ে অচেনাজন হিসেবেই মিশে থাকতে ভালোবাসত বিপ্লব। অথচ কতই না স্বতন্ত্র ছিল সে আর পাঁচজনের থেকে। সততা এবং আদর্শনিষ্ঠার বিচারে বিরল প্রকৃতির মানুষ ছিল বিপ্লব। এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে ওর হাসিমুখ ছাড়া দেখেছে। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে শুনেছে বিপ্লব কখনও নিজের দুঃখের কথা বলেছে। এমন কথা কখনও কেউ শোনেনি যে, বিপ্লব কারো নিন্দা করেছে। অথচ কতই না নির্যাতন ওকে সইতে হয়েছে সারা জীবন। কতই অন্যায় সইতে হয়েছে। কতই না যন্ত্রণা সইতে হয়েছে অসুস্থতার কারণে। কতই না-খেয়ে থাকতে হয়েছে অভাব অনটনে। সব কিছু সয়েছে ও নীরবে। একা একা।

এই রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনের একদম গোড়ার দিকের কর্মী বিপ্লব। পড়াশুনা ছেড়েছে আন্দোলনের ডাকেই। সেই 1948 সালে। যখন এরাজ্যের বহু তরুণ যুবক বি. টি. রণদিভের ডাকে সাড়া দিয়ে ছেড়েছিল ঘর—বিপ্লব ছিল তাদেরই একজন। কতই বা বয়স তখন ওর। বছর উনিশ হবে। সেই শুরু। এরপর 1954 সালে ট্রাম শ্রমিকদের আন্দোলন। 1959 সালের খাদ্য আন্দোলন—সবেতেই উৎসাহী কর্মী। কখনও শহরে কখনও প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে।

পরপর দুবার বিভাজন হয় কমিউনিস্ট পার্টির—ষাটের দশকে। দুবারই বিপ্লব থেকে গেছে বিপ্লবী অংশে। বিভিন্ন পর্যায়ের বামপন্থী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন যারা তাদের খুব কাছাকাছি থেকেও নিজেকে আড়ালে রাখতে পেরেছিল বিপ্লব। তরুণ বয়সেই টিউবারকুলোসিসে আক্রান্ত হয়ে স্যানাটোরিয়ামে কাটাতে হয়েছিল দুবছর। এরপর থেকে ব্রঙ্কাইটিশ ওর নিত্যসঙ্গী। তার সাথে হাঁপানি ও মাঝে মধ্যে রক্তবমি। এই অসুস্থতা নিয়ে কাটাতে হয়েছে তাকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। সব সে সয়েছে নিঃশব্দে।

তবে ও সইতে পারত না যা তা হলো কোনো ধরণের অসততা ও নীচতা। সেটা যদি তার বাবা করত তা হলেও নয়। ফলে হারাতে হয়েছিল বাবার আশ্রয়। কারণ ওর বাবা একবার ওর মাসতুতো ভাইদের ঠকানোর চেষ্টা করলে ও তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং তার সেই চেষ্টা বানচাল করে দেয়। পরবর্তীকালে এই মাসতুতো ভাইয়েরাই ষড়যন্ত্র করে ওকে ঘরছাড়া করে। রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয় বিপ্লবকে। এবার কিন্তু আর রুখে দাঁড়ায় না বিপ্লব—বন্ধুদের আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও। কারণ নিজের জন্য লড়াই করার কথা জানত না বিপ্লব। ফলে জনকয় বন্ধুর উদ্যোগে ওর আশ্রয় মেলে মির্জাপুরের ওয়ার্কার্স পার্টির অফিস ঘরে। অবশ্য কিছুদিন হলো বন্ধুরা চেষ্টা-চরিত্র করে ওর মাসতুতো ভাইদের দমিয়ে ওকে নিয়ে তুলেছিল ওর বাসায়। তবে বেশিদিন আর কাটাতে হলো না ওকে, ওই 'অনাত্মীয়' পরিবেশে।

বিপ্লব ওর কর্মময় জীবন দান করেছে 'মানুষের মুক্তি'র জন্য। নিজের বলে কিছুই ছিল না ওর—দেহখানা ছাড়া। সেটা বিপ্লব দান করে রেখেছিল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে। সেই দান গ্রহণ করেছে হাসপাতাল।

একজন নির্লোভ ভালোমানুষ কমে গেল। পৃথিবী খানিক গরিব হলো। আমরা একজন বন্ধু হারালাম।

অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম

অ্যাশ্‌লে মন্টাগু

মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা প্রকৃতির-ই নিয়ম। এক সময় এমনটাই মনে করতেন সামাজিক ডারউইনবাদীরা। প্রতিযোগিতা ছাড়াও যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রক্রিয়া সচল প্রকৃতিতে, মানতেন না তাঁরা। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সহজ করে লেখা একটি বই 'On Being Human'। লেখক অ্যাশ্‌লে মন্টাগু। বইটির প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম "Struggle for Existence"। তার সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ এটি। — স.ম.।

ঊনিশ শতকের বিশেষ একটি ভাবনার উত্তরাধিকার বর্তেছে আমাদের সকলের ওপর। জীবন মানেই সংগ্রাম আর পরস্পরের মধ্যে লড়াই—এই হলো তার নিগূঢ়ার্থ। সব থেকে ওস্তাদ যারা এই লড়াইতে তারাই পারে টিকে থাকতে। দুর্বল যারা, বিপন্ন হবে তাদের অস্তিত্ব। সেটাই স্বাভাবিক। জঙ্গলের পশুদের মতো। নখ আর দাঁত দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে বেঁচে থাকা। মানুষের ক্ষেত্রে তফাৎ শুধু—নখ লুকানো থাকে দস্তানার আড়ালে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা আছে যে, ঊনিশ শতকের এমন সব ধারণার উৎপত্তি পশু জগতের নিয়ম কানুন সম্পর্কে ধারণা থেকে। এটা সঠিক ধারণা নয়। বরং উলটোটাই সত্য কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি আজও। মনে হয় মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে কিছু ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে এই ধরণের ভাবনা।

শিল্প বিপ্লবের উন্মেষ হয় প্রথমে ইংলন্ডে। সেখানকার ধনী অভিজাত বংশের লোকজন ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কলকারখানা শুরু করে ব্যাপকভাবে। তখন মজুরি ছিল অল্প। আর সে মজুরি যাতে বাড়তে না পারে তারদিকেও ছিল তাদের কড়া নজর। তারাই হয়তো চাউর করেছিল কিছু কথা। যেমন মজুর শ্রেণীর লোকজন মানে নিচু মানের মানুষ। সে-জন্যই তাদের এমন দুর্দশা। এইভাবেই বংশানুক্রমে যাতে তাদের মজুর হিসেবে বেঁধে রাখা যায় তার বন্দোবস্ত করেছিল তারা। এছাড়াও নজর রাখা হয়েছিল যাতে একটি বড়সড় বেকার-বাহিনী মজুত থাকে সর্বদা।

এমনই এক সময়ে টমাস রবার্ট ম্যালথাস (1766–1834) প্রকাশ করেন জনসংখ্যা সম্পর্কে তাঁর তত্ত্ব—*Essays on Population*। যার মধ্যে দিয়ে তিনি জন্ম দেন এক সুদূর-প্রসারী ভাবনার। তিনি বলেন যে, দারিদ্র্য আর দুর্দশার হাত থেকে নিস্তার নেই মানুষের। কারণ মানুষের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেঁচে থাকার উপকরণ বাড়ছে না সেই হারে। ফলে এ নিয়ে কাড়াকাড়ি অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই গতি রুদ্ধ হতে পারে একমাত্র যুদ্ধ আর মহামারীর মধ্য দিয়েই। পরে অবশ্য তিনি তাঁর মত খানিক বদলেছিলেন। বলেছিলেন, মানুষের মূল্যবোধ বদলালেও সম্ভব হতে পারে তা। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব তৎকালীন ধনী শ্রেণীর খুবই মনঃপুত হয়েছিল।

ম্যালথাসের মনে হয়েছিল মানুষের জীবন মানেই প্রতিনিয়ত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। এর মধ্যে দুর্বল যারা তাদের হঠে যেতে হয়েছে যুগ যুগ ধরে। চার্লস ডারউইন ম্যালথাসের এই রচনা পাঠ করেন ঊনিশ-শ আটত্রিশ সালে। তখন তিনি প্রাণী জগতের বিবর্তনের সূত্র নিয়ে ভাবছিলেন। এই রচনার মধ্য থেকেই তিনি পেয়েছিলেন তাঁর প্রচারিত তত্ত্বের মূল কাঠামোটি। সেটা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। দীর্ঘ কুড়ি বৎসর ধরে তিনি তাঁর সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণাদি নিয়ে গবেষণা চালিয়ে অবশেষে প্রকাশ করেন তাঁর রচনা। সেটা 1859 সাল। এর পর থেকে গোটা ঊনিশ শতক ধরে দুনিয়ার প্রায় সব প্রাণীতত্ত্ববিদেরাই এই 'favoured species' এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ করে গেছেন।

ডারউইন তাঁর *Origin of Species*-এ ঠিক কী বলতে চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে তিনি নিজেই এক জায়গায় বলছেন যে—'জীব জগতের যে কোনো প্রাণীর টিকে থাকার সংগ্রামকে দেখতে হবে তাদের বংশবৃদ্ধির হারের আলোতেই। এ-ব্যাপারে ম্যালথাসের মতবাদকেই পশু ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেহেতু যত সংখ্যায় টিকে থাকা সম্ভব এই প্রাণীদের পক্ষে, তার থেকে বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এদের সংখ্যা, ফলে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই নিজেদের মধ্যে চালিয়ে যেতে হয় নিরন্তর লড়াই। সে ক্ষেত্রে যত সামান্যই হোক,

কিছু সুবিধে হয় এমন কোনো পরিবর্তন যদি ঘটে এদের দৈহিক গঠনে তাহলে চারপাশের জটিল ও সতত পরিবর্তনশীল প্রতিকূল পরিবেশে তাদের পক্ষে টিকে থাকার সম্ভাবনা স্বাভাবিক কারণেই খানিকটা বেশি হতে বাধ্য। অর্থাৎ টিকে থাকার দৌড়ে এগিয়ে থাকবে এরাই।'

ম্যালথাসের বইয়ের প্রচার ভালোই ছিল সে-সময়। তবে ডারউইন এসে ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন। শুধু প্রাণীতত্ত্ববিদদের কাছেই নয় অন্য অনেকের কাছেই তাঁর এই তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল নানান কারণে। এবং সকলেই যে যার মনের মতো ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর এই তত্ত্বের। প্রাণীতত্ত্ববিদরা একরকম অর্থে ব্যাখ্যা করছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ী শিল্প কলকারখানার মালিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল অন্য কারণে। প্রথমোক্তদের কাছে এর দুটো দিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে : এক, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই-ই একমাত্র পথ। দুই, এই লড়াইতে সব থেকে দক্ষ যারা তারাই পারবে টিকে থাকতে। দুর্বল যারা তাদের কোনো স্থান নেই সেখানে। অন্যদিকে কল-কারখানা ব্যবসার মালিকদের নিজেদের মধ্যে চালু ধারণার সপক্ষে জোরাল যুক্তি হিসেবে মনে হয়েছে এই তত্ত্ব। অর্থাৎ মজুররা যেহেতু নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব, তাই তাদের দুঃখ কষ্ট —এটাই স্বাভাবিক।

'জীবন মানেই যুদ্ধ' এই যখন রব চারিদিকে তখন এর সাথে যোগ দিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত টমাস হেনরি হাক্সলে। 1880 সালে তিনি 'অস্তিত্বের জন্য লড়াই' নামে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন ডারউইন তত্ত্বের সপক্ষে। এই পুস্তিকায় তিনি জানালেন—'জীব-জন্তুদের জগৎটা গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই প্রদর্শনের মতোই। ... সে লড়াইতে সব থেকে শক্তিশালী ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন এবং ধূর্ত যে সেই টিকে থাকতে পারে পরের দিনের আরেকটি লড়াইয়ের জন্য।' আদিম মানুষদের সম্পর্কে তাঁর অভিমত হলো— দুর্বল এবং অপদার্থ যারা তাদেরকেই হঠে যেতে হয়েছে যুগ যুগ ধরে। বলশালী ও চালাক-চতুর যারা, অন্য ব্যাপারে তেমন দর না হলেও টিকে যেতে পেরেছিল তারাই। ... জীবন মানেই যুদ্ধ। তাই পারিবারিক গণ্ডিটুকু বাদ দিয়ে প্রতিটি মানুষ প্রতিনিয়ত তার চারপাশের প্রত্যেকটি মানুষের সাথে লিপ্ত যুদ্ধে।

মৃত্যুর দু-বৎসর আগে অবশ্য তিনি একটু অন্যভাবে বলেছিলেন কথাটি। 1853 সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বীকার করেছিলেন যে, 'অস্তিত্বের জন্য লড়াই'-এর পাশাপাশি প্রাণী জগতে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টিও উপেক্ষণীয় নয়। তিনি আক্ষেপের সাথে জানিয়েছিলেন যে, এই বিষয়ে সম্যক উপলব্ধি না থাকায় এক শ্রেণীর লোক অন্ধভাবে প্রাণী জগতের এই সূত্রগুলিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে।

কিন্তু এই উপলব্ধিতে পৌঁছতে তাঁর একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। কারণ সমাজ জীবনে এই ভাবনা তখন বেশ পাকাপোক্তভাবেই গেড়ে বসেছে। মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা থেকে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই এবং প্রতিবেশী ও দুর্বলদের ওপর অত্যাচারও সমর্থিত হচ্ছিল সমাজে— এই তত্ত্বের দোহাই পেড়ে। ভাবখানা যেন— এটাই তো স্বাভাবিক। প্রকৃতিরই নিয়ম এটা।

ইংরেজ সমাজতাত্ত্বিক হারবার্ট স্পেনসর ছিলেন এই তত্ত্বকে মানুষের সমাজে প্রয়োগের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। একদিকে ম্যালথাসের তত্ত্বও তাঁর মতবাদ গঠনে সাহায্য করেছিল। এরপর ডারউইনের মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পর প্রাকৃতিক নিয়মের মর্যাদায় তিনি এই তত্ত্ব প্রচার করতে থাকেন। যেটা কালক্রমে 'সামাজিক ডারউইনবাদ' হিসেবে পরিচিত লাভ করে। তিনি বললেন যে, প্রাণী জগতের মতোই মানব সমাজের বিবর্তন ও অগ্রগতি একই নিয়মের অধীন। অর্থাৎ একটি জাতি বা গোষ্ঠী টিকে থাকার যোগ্য কি-না তা স্থির হতে পারে লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই। যেমনটা যুদ্ধবাজ সেনানায়করাই সাধারণত মনে করে থাকেন। একই সূত্র ধরে মার্কিন শিল্পপতি জন রকফেলারও যেমন বলে থাকেন ব্যবসায়িক সংগঠনের নিয়মটাও একই— যোগ্যতরদের টিকে থাকা।

পশ্চিমী দেশগুলিতে সাধারণ জনমানসেও এই বিশ্বাস ক্রমে বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে আজ। তাই বড় বড় ব্যবসায়ীরা সদম্ভে ঘোষণা করতে পারছে যে—'পরিকল্পনামাফিক পৃথিবীটাকে যে খানিক নরম তরম করে গড়া— সেটা সম্ভবই নয়। এখানে প্রবলতর পক্ষকে ছেড়ে দিতেই হবে জায়গা। প্রকৃতিরই নিয়ম এটা।'

আধুনিক মানুষের মনেও এই বোধ সক্রিয় আজ যে, মানুষ তার নিজের জন্যই বাঁচে, প্রয়োজনে অপরের ক্ষতি করে হলেও। মার্কিনী সমাজে এটাই আজ আদর্শ। এটাই হলো ব্যক্তিবাদ। ইওরোপেও এমনটাই চল। ফলে মানুষ আজ বড়ই নিঃসঙ্গ। প্রতিটি মানুষ নিজেকে নিয়ে এক একটি দ্বীপ। এরা বিশ্বাস করে, সে যদি নিজের স্বার্থ না দেখে তো কে তাকে দেখতে

আসবে এগিয়ে? কারণ সবাই তো সামিল এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায়।

পশ্চিমী দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষ এই ভ্রান্ত আদর্শে বিশ্বাসী। প্রাণী জগতের নিয়মকানুন মানুষের আচরণের কিছু কিছু দিক নির্দেশ করে ঠিকই। কিন্তু সেটা সামাজিক ডারউইনবাদীরা যে দিকের কথা বলে তা নয়। ডারউইন স্বয়ং এর গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন এবং অন্যদের বোঝানোরও চেষ্টা করেছিলেন। হয়তো সেজন্যই অবস্থা খানিকটা সামাল দেওয়ার জন্যই তিনি পরে আরও একটি রচনা প্রকাশ করেন—*The Desent of Man* এই শিরোনামে। এই বইতে তিনি অতি জোরের সাথে 'সহযোগিতার সূত্রের' কথা বলেন। তিনি বলেন যে, 'মানুষের সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ছোট ছোট জনগোষ্ঠী একত্রিত হয়ে যেমন বড় বড় জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছিল তখন স্বাভাবিক কারণেই প্রতিটি মানুষ অনুভব করছিল চেনা-অচেনা নির্বিচারে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে এবং সামাজিক বোধ বিস্তৃত করতে হবে। এই অনুভবে একবার পৌঁছতে পারলে অন্য জাতি এবং গোষ্ঠীর প্রতি তার সহানুভূতিশীল হওয়ার পথে কোনো বাধা থাকে না। বাধা কিছু হলেও সেটা কৃত্রিম বাধা-ই।' আঠেরো-শ একাত্তর সালে এই বই প্রকাশিত হয়। তথাপি সামাজিক ডারউইনবাদীদের ডারউইন তত্ত্বের স্থূল বিচার এবং প্রয়োগের প্রবাহকে রোধ করা সম্ভব হয়নি।

প্রাণীজগতের বেশির ভাগেরই সামগ্রিক কর্মকাণ্ড 'অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই' হিসেবে চিহ্নিত করা গেলেও এটাই তাদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য তা বলা চলে না। বরং পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া তথা সহযোগিতার বৈশিষ্ট্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং এই দুই বৈশিষ্ট্য একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে বিদ্যমান প্রাণী জগতে। অথচ ডারউইনোত্তর ঊনিশ শতক পর্ব জুড়ে বিবর্তনের যুদ্ধবাদী ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন ছিলেন বেশির ভাগ প্রাণী বিশেষজ্ঞ এবং স্পেনসর অনুগামী সমাজতাত্ত্বিকগণ। বস্তুতপক্ষে এই পর্বের প্রায় তাবৎ সমাজতাত্ত্বিকরাই স্পেনসরের ভাবধারার অনুগামী ছিলেন যদিও সে সময় কিছু কিছু মানুষ প্রাণী জগতে পারস্পরিক সহযোগিতার দৃষ্টান্তগুলি তুলে ধরছিলেন, তথাপি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বের ব্যাখ্যায় সে দৃষ্টান্তগুলি উপেক্ষিতই হচ্ছিল। এবং আঠেরো-শ অষ্টআশি সালে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পক্ষে সব থেকে কট্টর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন স্বয়ং হাক্সলে— যে কথা আগেই বলা হয়েছে। তখন ধৈর্য ধরে এই কট্টর দৃষ্টিভঙ্গির জবাব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন একজন— যার নাম প্রিন্স পিটার ক্রুপটকিন। 1890 থেকে 1896 সালের মধ্যে মোট আট কিস্তিতে প্রকাশিত হয় তাঁর বক্তব্য *নাইন্‌টিন্‌থসেন্‌চুরি* নামে পত্রিকায়। এই প্রবন্ধগুলি একত্রিত করে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয় 1902 সালে *Mutual Aid — A Factor in Evolution* নামে। যিনিই পড়েছেন এই বই, তাঁরই মনে গভীর রেখাপাত করেছে এই বইয়ের যুক্তি।

ক্রুপটকিন তাঁর এই বইয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, অদৃশ্য একটি শক্তি যেন গোটা জৈব জগৎ জুড়ে বিদ্যমান যা অবচেতনভাবে প্রতিটি জীবের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতার আকারে বিদ্যমান সর্বদা, যা প্রত্যেক ধরণের প্রাণের টিকে থাকায় বড় আকারে সাহায্য করে। ক্রুপটকিন দেখাতে চেয়েছেন, প্রত্যেকটি মানুষও তার নিজের অবচেতনেই পারস্পরিক সহযোগিতার চর্চা চালিয়ে যায়। এবং অবচেতন ভাবেই মানুষের মধ্যে এই বোধ স্বীকৃত যে প্রত্যেকের সুখ, আর সকলের সুখের ওপর নির্ভরশীল। আবার অবচেতন ভাবেই মানুষের মধ্যে এক ধরণের ন্যায় ও সাম্যের বোধ বিদ্যমান থাকে যার দ্বারা সে নিজের অধিকারের মতোই অন্যের অধিকারকেও স্বীকার করে থাকে।

ক্রুপটকিনের বইটিই বোধহয় প্রথম যা বিংশ শতাব্দীতে এসে এই ধরণের ভাবনা এবং এ নিয়ে গভীর অনুসন্ধানের প্রেরণা জোগায়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে তাই দেখতে পাই যে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামে'র তত্ত্বের পাশাপাশি 'পারস্পরিক সহযোগিতার' সূত্রটিও সর্বজন স্বীকৃত আজ।

ভাবানুবাদ : **রবীন চক্রবর্তী**

শিক্ষাব্যবস্থার নানাদিক সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ

মানস জোয়ারদার-এর

চ্যান্সেলরস অফ ভাইস ও অন্যান্য

প্রকাশক :

নান্দীমুখ সংসদ ; ৫৯, আর. কে. পল্লী, কলকাতা ৭০০ ০৭৮

পিটার আলেকজান্ডার ক্রপটকিন

পৃথিবীকে যারা নিরাজ সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন—পিটার ক্রপটকিন তাদের একজন। এমন সমাজের বাস্তব রূপায়ণের সম্ভাব্যতা কতখানি সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। এটা সত্য যে, এই স্বপ্ন রূপায়ণের আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিলেন এই মানুষটি। এই স্বপ্ন কিন্তু আজও অনেক মানুষকে উদ্বেল করে, উজ্জীবিত করে সমাজ বদলের সংগ্রামে। এমন একটি সমাজ হবে যেখানে মানুষ হবে মুক্ত স্বাধীন এবং সব ধরণের কর্তৃত্ব খবরদারি ও চোখ রাঙানি থেকে মুক্ত। সেখানে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সহমর্মিতা আর সহযোগিতার ভিত্তিতে চলবে সমস্ত লেনদেন। এমন সব লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যে সমাজ দর্শন তার-ই নাম নৈরাষ্ট্রবাদ। এই দর্শনের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি অনুসন্ধানের কাজই করে গেছেন ক্রপটকিন। তাঁরই সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য এই প্রবন্ধ। স.ম.

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ...

ঊনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান নৈরাষ্ট্রবাদী দার্শনিকদের একজন, যাঁকে আজকের লোকে বিশেষভাবে জানে বৈজ্ঞানিক এবং *Mutual Aid—A Factor in Evolution* বইটির লেখক হিসেবে— সেই পিটার ক্রপটকিন সম্পর্কে জানতে বা লিখতে গিয়ে ওপরের লাইনটি অনিবার্যভাবেই মনে আসে। কেমন ছিলেন তিনি মানুষ হিসেবে? Paul Avrich বলছেন— "A saint without God" ; অস্কার ওয়াইল্ড বলছেন, তাঁর দেখা সবচেয়ে "নিখুঁত" দুটি জীবনের একটি হলো পিটার ক্রপটকিন। আর যাদের সঙ্গে মিলেমিশে সাংগঠনিক কাজেকর্মে কাটিয়েছেন জীবনের অনেকটা সময়, সেই ফরাসি শ্রমিকেরা তাঁকে ভালোবেসে বলত 'নত্র্ পিয়ের'—'আমাদের পিটার'। সহমর্মী বিপ্লবী বন্ধুদের বৈঠক থেকে শুরু করে শ্রমিকদের জমায়েত কিংবা বৈজ্ঞানিক সভা—সর্বত্রই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ, সর্বত্রই তিনি ছিলেন সমানভাবে আদরণীয়। একটি নিটোল সংগীতের মতোই তাঁর জীবন—যার leitmotif ছিল আদর্শ আর জীবনযাপনকে মেলানোর আন্তরিক চেষ্টা।

শৈশব, কৈশোর, প্রথম যৌবন

1842 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সর্বোচ্চ স্তরের এক অভিজাত বংশে প্রিন্স পিটার আলেকজান্ডার ক্রপটকিন-এর জন্ম। বাবা ছিলেন রাজকীয় বাহিনীর পদস্থ অফিসার। অভিজাত বংশীয়দের যাবতীয় বদ্‌গুণই তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন পিটার ও তাঁর দাদা আলেকজান্ডার। দু ভাই এর ঢের বেশি ভালো লাগত মা-র সঙ্গ, যাঁর কোমল স্বপ্নময় মনটি ওই ক্লেদাক্ত পরিবেশেও হারিয়ে যায় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই মা বেশিদিন বাঁচলেন না। তাঁকে হারিয়ে পিটার সান্ত্বনা খুঁজলেন প্রকৃতির কোলে। মস্কো থেকে এক-শ ষাট মাইল দূরে কালুগা প্রদেশে বাবার জমিদারিতে দাসদাসীদের তত্ত্বাবধানে রইলেন দুই মাতৃহারা বালক। বৈষম্যমূলক সমাজের চেহারাটা এই সময় থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর মনে—একদিকে হতভাগ্য ভূমিদাসদের দুরবস্থা আর অপরদিকে তাদের ওপর পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের অত্যাচার। তাদের জীবনযাপনের সঙ্গে নিজেদের জীবনযাত্রার আকাশ পাতাল প্রভেদ শিশুমনে গভীর দাগ কেটেছিল।

1857 খ্রিস্টাব্দে একটি অনুষ্ঠানে তৎকালীন জার প্রথম নিকোলাস-এর সুনজরে পড়েন এই উজ্জ্বল কিশোরটি। সম্রাটের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীতে যোগদানের জন্য তাঁকে মনোনীত করে পাঠানো হয় সেন্ট পিটার্সবুর্গের বিশেষ সামরিক শিক্ষালয়ে। শিক্ষান্তে সাইবেরিয়ার প্রান্তরে কসাক বাহিনীর অধিনায়ক ও শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হন পাঁচ বছরের জন্য।

এই সময় সাইবেরিয়ার ভূপ্রকৃতি এবং অধিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল পিটার-এর, যার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে গ্রাম্য কৃষকদের সহজ সরল জীবনযাত্রা তাঁকে শিখিয়েছিল যে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যে রসদটুকু প্রয়োজন তা আসলে খুবই সামান্য; 'সভ্যতা'র গণ্ডির বাইরে না বেরোলে যা প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। শুধু তাই নয়, কৃষকদের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখেছিলেন বিপদে-আপদে পরস্পরকে সাহায্য করবার, তাও এক বিশেষ অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল তাঁর কাছে। পরবর্তীকালে 'স্মৃতিকথা'য় ক্রপটকিন লিখেছেন যে,

'সাইবেরিয়াতে থাকার সময়ে রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খলা সম্পর্কে যাবতীয় বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলি। এটাই ছিল আমার নৈরাষ্ট্রবাদী হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্ব।' মানুষের গোষ্ঠীজীবনের মধ্যে যে স্বেচ্ছা-উদ্যোগের পরিচয় পেয়েছিলেন তার প্রতি সুদৃঢ় আস্থা গড়ে ওঠে তাঁর মনে। শুধু মানবজীবন নয়, সাইবেরিয়ার ভূ-প্রকৃতি আর প্রাণী জগতের সঙ্গেও পরিচিত হলেন ক্রপটকিন, যা পরবর্তীকালের 'বৈজ্ঞানিক' ক্রপটকিন-এর গড়ে ওঠার একটা মূল্যবান ধাপ ছিল অবশ্যই।

ইতিমধ্যে 1863 খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ডের বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার, এবং কয়েকজন পোল বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ডাদেশ হয়। এই সমস্ত ঘটনাবলী ক্রপটকিনকে ক্রমশ আরও বীতশ্রদ্ধ করে তোলে রাষ্ট্র সম্পর্কে। 1867 খ্রিস্টাব্দে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি ফিরে আসেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে।

বৈজ্ঞানিক পিটার ক্রপটকিন

1867 -তে সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত নিয়ে পড়তে ভর্তি হলেন পিটার, সঙ্গে সঙ্গে রুশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক হিসেবে কাজকর্ম চালাতে থাকেন। ভূগোল-বিষয়ক গবেষণা শুরু করেছিলেন সাইবেরিয়ায় থাকতে। সেই কাজের ফলে এশিয়া মহাদেশের এযাবৎ 'অনাবিষ্কৃত' হিসেবে চিহ্নিত কিছু অঞ্চলের মানচিত্র আঁকা সম্ভব হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এশিয়া মহাদেশের মূল গঠনরেখা-সমূহ যে কোনাকুনিভাবে আছে, সেটাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর কাজের দ্বারাই।

এর মধ্যে 1871 -এ 'পারী কমিউন'এর খবর এসে পৌঁছয়, তাতে উদ্দীপনা বোধ করেন, যদিও গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন — ফিনল্যান্ড ও সুইডেনের বরফাবৃত অঞ্চলে অভিযান করেন সেই বছর। পরের বছরেই পশ্চিম ইওরোপে। সেকালের তরুণ বিপ্লবীদের এক তীর্থক্ষেত্র ছিল জেনিভা। সেখানেই শ্রমিক আন্তর্জাতিকের নৈরাষ্ট্রবাদী দলের মূল ঘাঁটি। জেনিভার ঘড়ি শ্রমিকদের সংগঠন 'জুরাসিয়ান ফেডারেশন' (Jurassian Federation)-এর সদস্যরা ছিলেন নৈরাষ্ট্রবাদী বিপ্লবী বাকুনিন-এর মতাদর্শে অনুপ্রাণিত। এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো ক্রপটকিনের। 'ঘড়ি শ্রমিকদের সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটিয়ে যখন পাহাড় থেকে নেমে এলাম, ততদিনে সমাজবাদের ব্যাপারে আমার মতামত তৈরি হয়ে গেছে—পুরোপুরি নৈরাষ্ট্রবাদী আমি'—পরবর্তীকালে 'স্মৃতিকথা'র লিখেছেন ক্রপটকিন।

তরুণ বিপ্লবী

এই সময় থেকেই ক্রপটকিনের মনে ক্রমশ এই ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উচ্চস্তরের শিক্ষাদীক্ষা ও গবেষণা সবকিছুই ক্ষমতাসীন শ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত। তাই চারদিকের দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে বৈদগ্ধ্যের গজদন্তমিনারে বসে গবেষণার আনন্দ ও যশ উপভোগের স্পৃহা ত্যাগ করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকেই আঁকড়ে ধরতে থাকলেন ক্রমশ। যোগ দিলেন 'চাইকভস্কি চক্র' নামক সংগঠনে, যাদের কাজ ছিল মূলত মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবুর্গের আশেপাশে ছাত্রদের জড়ো করা ও তাদের মাধ্যমে কৃষক ও শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা। বোরেডিন ছদ্মনামে গুপ্ত প্রচারকার্য চালানোর সময়ে ক্রপটকিন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তাঁকে চালান করে দেওয়া হলো কুখ্যাত 'পিটার অ্যান্ড পল' দুর্গে, যেখানে সাধারণত রাজদ্রোহীদের স্থান হতো। দাদা আলেকজান্ডার এখানে ভাইকে দেখতে আসতেন। তাঁকেও সন্দেহ-বশে সাইবেরিয়ায় 'নির্বাসন' দেওয়া হলো। পিটার-এর বোন, ভাই, ভ্রাতৃবধূ—কেউই রেহাই পেলেন না পুলিশের নির্যাতনের হাত থেকে। একটিমাত্র মিথ্যা কথার বিনিময়ে মুক্তি অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে—সে প্রস্তাব অবহেলায় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পিটার।

বছর দুয়েক কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্য এত ভেঙে পড়ে যে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেন্ট পিটার্সবুর্গের উপকণ্ঠে এক সামরিক হাসপাতাল পাঠান। সেখান থেকে সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। একেবারে দেশ ছেড়েই চলে যেতে হলো ইংল্যান্ড। তারপর সেখান থেকে সুইজারল্যান্ডে। এখানেই বিবাহ করলেন সোফি এনানিরেভ নামে এক মহিলাকে, আর 'জুরা ফেডারেশন'-এর সঙ্গে কাজকর্ম শুরু করলেন। ফেডারেশনের পক্ষ থেকে *ল্য রেভল্‌তে* বা *বিদ্রোহী* নামে এক পত্রিকা বের করলেন, যার ওপর সুইস সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করায় নাম পাল্টে করা হলো *ল্য রেভল্‌ত্* বা *বিদ্রোহ*। 1881 খ্রিস্টাব্দে রুশ সরকারের তাগিদে সুইস সরকার তাঁকে জেনিভা ছেড়ে যেতে বাধ্য করল। ক্রপটকিন দম্পতি চলে গেলেন প্রথমে লন্ডন ও সেখান থেকে ফ্রান্সে। কিন্তু সেখানেও পুলিশের হাতকড়া অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্য। শ্রমিক আন্তর্জাতিকের সভ্য হবার 'অপরাধে' পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ড হল। তবে এ কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোবার আগেই জন-আন্দোলনের চাপে ছাড়া পেলেন (1886)।

আবার ইংল্যান্ড। *ফ্রিডম* নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করলেন। জন্ম হলো 'Freedom Press Group'এর, যা অদ্যাবধি উদারনৈতিক লেখাপত্র প্রকাশ করে আসছে। মূলত নৈরাষ্ট্রবাদ সম্পর্কে প্রবন্ধ ছাড়াও অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লিখেছেন এই সময়ে—সেগুলি পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেই কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলত। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপকের পদে আসীন হবার আমন্ত্রণ আসে 1896 খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তাতে রাজি হন নি রাজনৈতিক কার্যকলাপে বাধা সৃষ্টি হতে পারে—এই ভেবে।

1880 থেকে 1910 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পিটার ক্রপটকিনের রাজনৈতিক মতবাদ ও তার বিবর্তনের চিত্র ধরে রাখা আছে এর মধ্যে প্রকাশিত তাঁর কিছু বই-এর মধ্যে।

ল্য রেভল্‌তের লেখার সঙ্কলনে 'তরুণদের প্রতি আবেদন' (1880); 'আইন ও শাসন কর্তৃত্ব' (1880); 'রুশ ও ফরাসি কারাগারে' (1887); 'রাষ্ট্র : তার ঐতিহাসিক ভূমিকা' (1896); 'নৈরাষ্ট্রবাদী সাম্যবাদ : মূল উপাদান ও নীতিসমূহ' (1896); 'ক্ষেত, কারখানা ও ওয়ার্কশপ' (1898)—এইগুলি তার মধ্যে প্রধান। তাছাড়া ফরাসি ভূগোলবিদ্ ও নৈরাষ্ট্রবাদী এলিসে রক্লু-র সম্পাদনায় ফরাসি কারাগারে বন্দী থাকাকালীন লেখা প্রবন্ধগুলির সঙ্কলন প্রকাশিত হয় 1885-তে— *পারোল দ্য রেভল্‌তে* বা *একজন বিদ্রোহীর কথা* নামে। ভূমিকায় রক্লু লিখেছিলেন, 'ক্রপটকিন জেলে আবদ্ধ আছেন এ কথা ভাবলে নিজেকে জিজ্ঞাসা না করে পারা যায় না—আমি মুক্ত কেন? মুক্ত থাকার চেয়ে বেশি যোগ্যতা আমার নেই বলেই কি?'

1892 খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে প্রথম প্রকাশিত *রুটির জয়* বইয়ে ক্রপটকিন কমিউনিজম্-ঘেঁষা নৈরাষ্ট্রবাদ-এর একটি রূপরেখা দিয়েছেন। ভবিষ্যৎ নিরাজ সমাজের চেহারা কেমন হবে ভেবেছিলেন তিনি, তার একটা ছবি পাওয়া যায় এ বইয়ে। *আধুনিক বিজ্ঞান ও নৈরাষ্ট্রবাদ* রুশ ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয় 1901 খ্রিস্টাব্দে।

এখানে তিনি নৈরাষ্ট্রবাদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একজন আধুনিক বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে এই ধারণাতেই উপনীত হচ্ছেন যে, প্রাকৃতিক জগৎ ও সমাজের বিবর্তনের 'স্বাভাবিক' নিয়মসমূহ নৈরাষ্ট্রবাদী মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরের বছরে প্রকাশিত *পারস্পরিক সহায়তা* তাঁর সর্বাধিক আলোচিত বই—যাতে সোশ্যাল ডারউইনবাদ-এর সমালোচনাই শুধু নেই, আছে বিবর্তনের একটি প্রধান উপাদানকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিচার করবার প্রয়াস। 1899-এ প্রকাশিত *একজন বিপ্লবীর স্মৃতিকথা*-য় পাওয়া যায় ছোটবেলা থেকে শুরু করে এক বিপ্লবীর গড়ে ওঠার মানস-ইতিহাস।

'জীবনটা নয় শস্যক্ষেতের এপার হতে ওপারে যাওয়া'

ইতিমধ্যে 1914-য় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্রপটকিন তাঁর পুরোনো ধ্যানধারণা বদলালেন এবং জনতাকে আহ্বান করলেন মিত্রশক্তিকে যুদ্ধে সাহায্য করবার জন্য ও জার্মান শক্তিকে রুখবার জন্য। সমাজবাদী ও নৈরাষ্ট্রবাদীরা প্রায় সবাই একবাক্যে এই মতের তীব্র সমালোচনা করলেন। মালাতেসতা, শাপিরো, গোল্ডমান ইত্যাদি নৈরাষ্ট্রবাদীরা এর পাল্টা ইস্তাহার প্রকাশ করলেন—ফলত নৈরাষ্ট্রবাদী শিবির পরিষ্কার দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

1917 খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হলো। দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশে ফেরার টান নতুন করে অনুভব করলেন ক্রপটকিন। নতুন সমাজের জন্মলগ্নে রাশিয়ায় ফিরে এলেন যতটা উদ্দীপনা নিয়ে—এসে সবকিছু দেখেশুনে ততটাই হতাশ হতে হলো। দেখলেন জনগণের উদ্যোগটা রয়েছে বটে প্রতি ক্ষেত্রেই—কিন্তু তার পিছনে রয়ে গেছে বলশেভিক দলের কঠোর নিয়ন্ত্রণ। যথারীতি এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন তিনি। বলশেভিকরা ওই সময় যাবতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও ব্যক্তিকে সমূলে বিনাশ করলেও ক্রপটকিনের ওপর হস্তক্ষেপ করে নি—ঠিক যেমন জার-এর আমলে টলস্টয় রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন। মস্কোর কাছে একটি গ্রামে বসবাস করতেন পিটার ক্রপটকিন এবং নিয়মিতভাবে লেনিনের সঙ্গে পত্রালাপ চালাতেন, নতুন সরকারের নানাবিধ অসঙ্গতিপূর্ণ ও অমানবিক কার্যকলাপের প্রসঙ্গে। ততদিনে তাঁর শরীরও ভেঙে পড়েছে। 1921-এর 8 ফেব্রুয়ারি রোগজর্জর শরীরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুশয্যায় পাশে ছিলেন শুধু স্ত্রী সোফি, কন্যা, জামাতা ও কয়েকজন বন্ধু। বলশেভিক পার্টি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে চেয়েছিল। পরিবারের সদস্যরা তাতে রাজি হননি।

রাজার ঐশ্বর্য ত্যাগ করে আজীবন পলাতক গৃহহীন বিপ্লবীর জীবনযাপনই শুধু নয়, সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো ওই অনিশ্চিত জীবনযাত্রার মধ্যে আদর্শ ও জীবনের নৈতিক মান সম্পর্কে কোনোদিন কোনো আপস করতে দেখে নি কেউ পিটার

ক্রপটকিনকে। বিপ্লবী রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যকলাপের মধ্যে জড়িয়ে থেকেও নৈতিক শুদ্ধতা বজায় রাখা—প্রায় অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে। মহান আদর্শের জন্য হীন উপায় অবলম্বনেও পাপ নেই—বিপ্লবী শাস্ত্রের এই মূলনীতিকে ক্রপটকিন স্বীকার করতেন না। তাই আশু সিদ্ধির আশায় সুনির্দিষ্ট নীতিমানকে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হতে দেন নি কোনোদিন। তাঁর স্বপ্নের সমাজবাদ মানুষের নৈতিক চেতনার ওপরই মূলত প্রতিষ্ঠিত—যে কাজে সেই চেতনা ক্ষুণ্ণ হয়, তা যতই কার্যকর হোক, শেষ বিচারে ক্ষতিকর—এই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। এই অনমনীয় বিবেক ও সততাই হয়তো তাঁর রাজনৈতিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। চারপাশের নৈতিক অবনমনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা একজন স্বপ্ন-দেখা মানুষ—এই ছবিটাই শেষ পর্যন্ত পিটার ক্রপটকিন।

স. চ.

পুলিশী নির্যাতনের বিরুদ্ধে

ঐতিহাসিক 'অর্চনা গুহ মামলা' সংক্রান্ত বই

BATTLE OF 'ARCHANA GUHA CASE'

Arguments, Counter-Arguments and Judgement at the Trial Court

Edited by Saumen Guha

[Human Justice in India Publication]

অফসেটে ছাপা ৩৫০ পৃষ্ঠার বেশি এ গ্রন্থের সাধারণ দাম ২০০ টাকা।

উজ্জ্বল অন্ধকার

(প্রথম পর্ব : ১৭ জুলাই ১৯৭৪-২২ জুন ১৯৭৭)

সৌমেন গুহ

অফসেটে ছাপা ৫৫০ পৃষ্ঠার বেশি এ গ্রন্থের সাধারণ দাম ১৫০ টাকা।

ফোকিমেজ প্রকাশনা

প্রাপ্তিস্থান : এল/ডি-৫ কুষ্টিয়া (অবন্তিকা) আবাসন, কলকাতা ৭০০ ০৩৯

পারস্পরিক সহায়তা — বিবর্তনের একটি উপাদান

পিটার ক্রুপটকিন

Mutual Aid — A Factor in Evolution বইটির লেখক পিটার ক্রুপটকিন। বইটি রচনার পেছনে একটি কাহিনী আছে। লেখক বইটির মুখবন্ধে-ই তার উল্লেখ করেছিলেন। এছাড়াও ওই মুখবন্ধেই তিনি জানিয়েছিলেন কিভাবে তিনি বইতে উল্লিখিত ভাবনায় পৌঁছে ছিলেন। এছাড়াও আছে সমসাময়িক কালে অনুরূপ ভাবনার অনুসারী লোকজন এবং তাদের বইয়ের কথা। এই সমস্ত বিষয় জুড়ে এই বইয়ের মুখবন্ধটি তৎকালীন সময়ের একটি চিত্রও বটে। — স.ম.

আমার যৌবনে আমি যখন পূর্ব সাইবেরিয়া এবং উত্তর মাঞ্চুরিয়া ভ্রমণ করছিলাম তখন প্রাণী জগতের দুটি দিক আমাকে বিশেষভাবে ভাবতে উৎসাহিত করেছিল। প্রকৃতির ভয়ানক তাণ্ডবের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রজাতিগুলো বেঁচে থাকার জন্য যে দুর্দান্ত সংগ্রাম করছে— সেটা ছিল তার অন্যতম একটা দিক। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মাঝে-মধ্যেই প্রাণী নিধন ঘটে চলেছে ; এর ফলে আমি যে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম সে সব জায়গার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই প্রাণের চিহ্নমাত্রও ছিল না বলা চলে। আর অন্য দিকটি ছিল সেই সব কিছু কিছু ছোট ছোট অঞ্চল যেখানে প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও যে অঢেল প্রাণী টিকে রয়েছে সেই বিষয়টি। সেই সব অঞ্চলে বহু খুঁজেও আমি একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে বেঁচে থাকার তীব্র সংগ্রামের দেখা পাই নি। যদিও সব ক্ষেত্রে ডারউইন নিজে বলেন নি, কিন্তু প্রায় সব ডারউইনপন্থীরাই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রামকেই প্রাণীর বেঁচে থাকার এবং বিবর্তনের অন্যতম উপাদান বলে মনে করতেন।

শীতের শেষে দুর্দান্ত বরফ ঝড় এবং তারপর ঘন কুয়াশা ইউরেশিয়ার উত্তরাংশ ঢেকে দিত। মে মাসের মাঝামাঝি গাছগুলো যখন ফল-ফুল-পাতায় ভরে যেত আর তার ফলে হরেকরকম পতঙ্গরা গাছগুলোকে ছেয়ে ফেলত, তখন ঐ দুর্দান্ত বরফ-ঝড় আর কুয়াশা ফিরে আসত। এই কুয়াশা আর বরফ-ঝড়ের সঙ্গে জুটত অবিশ্রান্ত তুষারপাত; জুলাই-আগস্টে এরা মিলে নিধন করত হাজারে হাজারে পতঙ্গকুলকে। লাগামহীন বর্ষায় আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে জলে ভরে যেত চারদিক। এই বিপুল বারিরাশিকে কেবল পূর্ব এশিয়া আর আমেরিকার কিছু অঞ্চলের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। অক্টোবরের শুরুতে তুষারপাতের সময়ে, ফ্রান্স বা জার্মানির সমান আয়তনের স্থানে পোকা-মাকড় থাকতে পারে না—হাজারে হাজারে তারা মৃত্যুবরণ করে। চণ্ড প্রকৃতির এই ভয়াবহতার মধ্যে আমি উত্তর এশিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীদের লাগাতার সংগ্রাম করতে দেখেছি। এই সব দেখেই ডারউইন বর্ণিত "অতি-বিবর্ধনের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক রাশ টানা" সম্পর্কিত ধারণার গুরুত্ব উপলব্ধি করি। তখনই বুঝতে পারি "প্রাকৃতিক রাশ টানা"র প্রক্রিয়া, একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বেঁচে থাকার সংগ্রামের চেয়ে বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দুটোর মধ্যে তুলনামূলক বিচারে প্রথমটি নিঃসন্দেহেই অনেক ওজনদার। উত্তর এশিয়ার যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রাণী নেই বললেই চলে— বুঝতে পারি কম প্রাণী সংখ্যাই এখানকার বৈশিষ্ট্য। এখানে খাদ্য এবং প্রাণধারণের জন্য ভয়ানক প্রতিযোগিতা দেখতে না পেয়ে একই প্রজাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার যে তৎকালীন ডারউইনীয় ধারণা ছিল তার প্রতি আমার গভীর সন্দেহ জাগে; পরবর্তী ধারণা এবং পর্যবেক্ষণ আমার এই সন্দেহকে গভীরতর করে। পক্ষান্তরে, যেখানে যেখানে আমি প্রাণের প্রাচুর্য দেখেছি সেখানেই আমার পর্যবেক্ষণ অন্য কথা বলে। হ্রদের জলে যে সব প্রাণীকুল কিলবিল করছে, ডিম পাড়া এবং বাচ্চার যত্ন করার জন্য তারা জলের একই অংশে ভিড় করছে, পতঙ্গদের যে সব বাসা আছে সেখানে; যে সব পাখি শীতের শুরুতে দূর দূরান্তে পাড়ি জমায় অথবা শীতের শুরুতে ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ যখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমুর নদীর শীর্ণতম অংশ অতিক্রম করে অন্য পারে হাজির হয়, এই সবক্ষেত্রেই আমি প্রাণীদের মধ্যে 'পারস্পরিক সহায়তা' এবং 'পারস্পরিক সাহায্যের' যে নিদর্শন দেখেছি তাতে আমার সহায়তার এবং সাহায্যের এই দিকটিকে প্রাণের জয়যাত্রার এবং বিভিন্ন প্রজাতির বেঁচে থাকার এক মৌলিক দিক বলেই মনে হয়েছে। শেষে বৈকালহ্রদ

এলাকার খাদ্যাভাবের অঞ্চলেও বুনো গরু অথবা ক্ষুদে ছুঁচোদের যেভাবে বিকশিত হতে দেখেছি **তাতে ঐ সময়ে, একই প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে যদি ভয়াবহ প্রতিযোগিতা থাকত তবে তারা ঐভাবে বেড়ে উঠতে পারত না।**

এর ফলে ডারউইনবাদ এবং সমাজবিদ্যার দিকে আমার ঝোঁক বাড়ে এবং এই দুই বিষয়কে সম্পর্কিত করে যে সব লেখা এবং পুস্তিকা আমার হাতে আসে তার কোনোটার সঙ্গেই আমার মত মেলে না। যদিও এই সব পুস্তিকা স্বীকার করে যে, মানুষের ধীশক্তি এবং জ্ঞানের ফলে মানুষে মানুষে সংগ্রামের তীব্রতাকে তারা অনেকটাই কমিয়ে আনতে পারবে কিন্তু তারা প্রত্যেকেই এটাও মেনে নেয় যে, প্রাণী জগতের মতো মানুষে মানুষে লড়াইটা আসলে একটি 'প্রাকৃতিক নিয়ম'।

এই দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়; এর মধ্যে ধরে নিতে হচ্ছে যে, প্রজাতির মধ্যে যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বিরাজ করছে, যে নিরন্তর প্রতিযোগিতামূলক মহারণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার মধ্যেই রয়েছে প্রগতির শর্ত; কিন্তু আজও এই ধারণা প্রমাণিত হয়নি অথবা পর্যবেক্ষণ ' .য়েও তা সমর্থিত হয় নি।

1880 সালের জানুয়ারিতে, সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ডীন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক কেস্‌লার রাশিয়ার প্রকৃতিবিদ্‌দের কংগ্রেসে "পারস্পরিক সাহায্যের সূত্র" নামে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা বরং এই বিষয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। অধ্যাপক কেস্‌লারের মতে, প্রজাতির মধ্যে **পারস্পরিক সংগ্রামের সূত্র ছাড়াও পারস্পরিক সহায়তার সূত্রও** রয়েছে; প্রাণীর সফলভাবে বেঁচে থাকার জন্য ; বিশেষত ক্রমাগত বিবর্তনের জন্য এই সহায়তার দিকটি সংগ্রামের দিকটির থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতপক্ষে এই ধারণাটি স্বয়ং ডারউইন নিজেই তাঁর *Descent of Man* গ্রন্থে ব্যক্ত করেছিলেন। এই ধারণাটি আমার এত সঠিক বলে মনে হয়েছিল যে, 1883 সালে এই ধারণাটি জানতে পারার পর থেকেই আমি এই ধারণার সপক্ষে তথ্য সংগ্রহ শুরু করি। কেস্‌লার এই ধারণাটির সামান্য আভাস মাত্র দিয়েছিলেন, কিন্তু এটাকে আরও জোরাল ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর জন্য তিনি জীবিত ছিলেন না; 1881 সালেই তাঁর দেহাবসান হয়।

কেস্‌লারের কেবল একটি ধারণার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে; তাঁর মতে "সন্ততির প্রতি অনুভূতি"ই প্রাণীকুলের পরস্পরের প্রতি সহায়তার মূল ঝোঁক। আমি মনে করি এই অনুভূতি এবং অন্যান্য সমস্ত উপাদান যা প্রাণীকুলের সামাজিক দিকগুলো বিকাশের জন্য দায়ী, তাদের কোন্‌টি ঠিক কি পরিমাণে এই সহায়তার জন্য ক্রিয়াশীল তা আমরা স্পষ্ট করে জানি না এবং তা এখনও আলোচনার স্তরে আসে নি। এই আলোচনা তখনই করা যাবে যখন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাতির মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা নিয়েই অঢেল তথ্য আমাদের হাতে থাকবে এবং সেই তথ্যগুলো নিয়ে বিতর্ক থাকবে না; তখনই আমরা সামাজিক অনুভূতির বিবর্তন এবং সামাজিক ব্যবহার নিয়ে কথা বলতে পারব। সামাজিক ব্যবহার স্পষ্টতই বিবর্তনের আদিতে যখন প্রাণিকুল যুথবদ্ধ হয়ে থাকত, তখন থেকেই উৎপত্তি হয়েছে। আমি তাই আমার পর্যবেক্ষণ, বিবর্তনের জন্য পারস্পরিক সহায়তার গুরুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি, এই পারস্পরিক সহায়তার উৎপত্তির গূঢ় কারণ অনুসন্ধান আমি অন্য গবেষকদের জন্য রেখে দিয়েছি।

গ্যয়টের মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও পারস্পরিক সহায়তার গুরুত্ব স্বীকার করে মন্তব্য করেছেন, 'এর সর্বজনীনতা যদি দেখানো যেত!" 1827 সালে একারম্যান গ্যয়েটেকে বলেন যে, তাঁর দুটি পোষা পাখি তাঁর হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যায়। পরের দিন তিনি দেখেন যে, ঐ পাখি দুটো সম্পূর্ণ অন্য দুটো প্রজাতির পাখির বাসায়, ঐ পাখির বাচ্চাদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় খাবার ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। গ্যয়টে এটা শুনে উত্তেজিত হয়ে পড়েন; পরে বলেন, "যদি আগন্তুককে খাদ্য ভাগ করে দেওয়া প্রাণী জগতের সাধারণ নিয়ম হয়ে থাকে তবে অনেক প্রহেলিকার সমাধান খুব সহজেই হওয়া সম্ভব।" পরের দিনই গ্যয়টে, তাঁর জীববিজ্ঞানী বন্ধু একারম্যানকে এই বিষয়ে একটি বিশেষ গবেষণা চালাতে বলেন; গ্যয়টের মতে এই গবেষণার ফলে "অমূল্য সব তথ্য পাওয়া যেতে পারে"। দুর্ভাগ্যক্রমে একারম্যানের এই বিশেষ গবেষণাটি আর করা হয় নি; তবে গ্যয়টের মন্তব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রেহম (Brehm) প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা নিয়ে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেছেন।

1872 থেকে 1886-র মধ্যে প্রাণীদের বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অনেক মূল্যবান বই প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এই প্রত্যেকটি বই-ই চমৎকার, কিন্তু পারস্পরিক সহায়তা নিয়ে আরও অনেক কিছুই বলা যায়। বিশেষত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রাক-মানব উৎপত্তির সপক্ষে যে সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ছাড়াও এই সহায়তা যে বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মেরই প্রতিফলন,

এই বিষয়ের উল্লেখ এই সব পুস্তকাদিতে নেই বললেই হয়। এস পি নাগ যখন পিঁপড়ে এবং মৌমাছির সমাজ নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে, তখন মানব সমাজের বিবর্তনের নিয়মকানুন অত ভালো জানা ছিল না। লানেসানের বইতে পারস্পরিক সহায়তার উল্লেখমাত্র আছে। বুখনারের বই-এর সঙ্গে আমি এক মত হতে পারি নি। বইটি একটি ভালোবাসার কবিতা উদ্‌ধৃত করে শুরু হয়েছে এবং তিনি প্রাণীকুলের মধ্যে ভালোবাসা এবং সহানুভূতি অনুসন্ধান করেই বইটি লিখেছেন। প্রাণিকুলের সামাজিকতা নেহাতই সহানুভূতি ও ভালোবাসায় পর্যবসিত করলে তার বিশ্বজনীনতাকে খাটো করা হয়।

যখন আমার অচেনা প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন লাগে তখন কেবল তার প্রতি ভালোবাসার বশবর্তী হয়েই আমি এক বালতি জল নিয়ে দৌড়ব না। বরং অনেক বিস্তৃত এক মানবিক সংহতি অথবা সামাজিক অভ্যাসের বশবর্তী হয়েই আমি আগুন নেভানোর উদ্যোগ নেব। প্রাণীকুলের জন্যও এটা সত্যি। কেবল ভালোবাসা অথবা সহানুভূতির (আমরা মানবিক অর্থে যা বুঝি) জন্যই একপাল ঘোড়া গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নেকড়ের আক্রমণ প্রতিহত করে না; কেবল ভালোবাসাই নেকড়েদের শিকারের সময় যূথবদ্ধ হবার প্রেরণা যোগায় না। একইভাবে বেড়ালের বাচ্চারা বা মেষ শাবকরা খেলতে উদ্বুদ্ধ হয় না। কোনো ভালোবাসাই, ফ্রান্সের সমতুল্য অংশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা হরিণদের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে একটি বিশেষ স্থানে জড়ো হয়ে নদী পারাপারের কথা বলে না। ভালোবাসা বা প্রবৃত্তির চেয়ে বহুগুণ বিস্তৃত এক অনুভূতিই এর জন্য দায়ী ; যা বহু সময় ধরে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। এই অনুভূতিই মানুষ এবং প্রাণীকুলকে পারস্পরিক সহায়তা এবং সমর্থনের জোর সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছে; শিক্ষা দিয়েছে কেমনভাবে সামাজিক জীবনকে আরও আনন্দময় করে তোলা যায়।

প্রাণী-শরীরতত্ত্ববিদদের কাছে অথবা নীতিশাস্ত্রর চর্চা যাঁরা করেন তাঁদের কাছে এই প্রভেদটি অত্যন্ত স্পষ্ট। ভালোবাসা, সহানুভূতি অথবা আত্মবলিদান আমাদের মূল্যবোধ গড়ে ওঠার ব্যাপারে অশেষ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু ভালোবাসা বা সহানুভূতির ওপর মানব সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নয়। মানবসংহতি-বোধের ওপরই (তা প্রবৃত্তির স্তরেও হতে পারে) তা প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি মানুষের এই অচেতন উপলব্ধি থেকে যে শক্তির জন্ম হয় তা আসে সহায়তা থেকেই, একজনের খুশির ওপর যে সবার খুশি নির্ভরশীল—এই ধারণা থেকে। এর ফলে একজনের যা অধিকার তা সবার জন্য সমানভাবে অধিকার হওয়া উচিত— এই বোধের জন্ম হয়। এই পূর্ব শর্তের ওপর নির্ভর করেই অন্যান্য উঁচুদরের মূল্যবোধ তৈরি হয়।

আমার ধারণা, *পারস্পরিক সহায়তা—একটি প্রাকৃতিক সূত্র এবং বিবর্তনের উপাদান* নামক বইটি এই বিষয়ে বিভিন্ন ধারণার মধ্যে যে সব ফাঁক রয়েছে, তা পূরণ করবে। তাই 1888 সালে হাক্সলে যখন *জীবনের জন্য যুদ্ধ* নামে ইস্তেহার জারি করেন, তখন আমি তার মধ্যে প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্যগত ভুল ধারণা দেখতে পাই। আমি তখন *ঊনবিংশ শতাব্দী* পত্রিকার সম্পাদক শ্রী জেম্‌স নোল্‌সের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডারউইনবাদী ঐ ইস্তেহার সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা পত্রস্থ করার অনুমতি প্রার্থনা করি। সম্পাদক মহোদয় তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান। আমি শ্রী বেট্‌সের সঙ্গেও এই নিয়ে আলাপ করি। উনি আমায় সমর্থন করেন এবং বলেন যে "ওরা ডারউইনবাদের কি দুর্দশা করেছে দেখ। তুমি এ বিষয়ে লেখো ; তোমার লেখা প্রকাশিত হবার পর আমি তোমাকে এই বিষয়ে একটা চিঠি দেব ; তুমি সেই চিঠিও প্রকাশ করতে পারো।" দুর্ভাগ্যক্রমে এই পর্যালোচনা করতে আমার সাত বছর লেগে যায় এবং ইতিমধ্যে বেট্‌সের দেহাবসান হয়।

প্রাণিকুলের মধ্যে এই পারস্পরিক সহায়তার গুরুত্ব আলোচনা করার পর আমি স্বভাবতই সেই একই উপাদান মানুষের বিবর্তনে কি ভূমিকা পালন করেছে তা আলোচনা করেছি। এই কারণে আমাকে এই আলোচনা করতে হয়েছে যে, আজ একদল বিবর্তনবাদী আছেন যাঁরা প্রাণিকুলের মধ্যে এই সহায়তার ভূমিকা মেনে নিলেও, মানুষের বিবর্তনে সেই একই উপাদানের গুরুত্ব অস্বীকার করছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন হারবার্ট স্পেনসর। তাঁদের মতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে সকলের **লড়াই-ই জীবনের সূত্র ছিল**। হব্‌সের সময় থেকে চলে আসা এই ধারণার পেছনে কতটুকু তথ্যগত ও তত্ত্বগত সমর্থন আছে তা আমি এই বই-এ বন্য ও বর্বরদের বিষয়ে আলোচনার সময় বিচার করেছি।

বন্য ও সাধারণ যুগে পারস্পরিক সহায়তা নিয়ে গড়ে ওঠা উদ্যোগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং তাদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, এমন কি প্রাথমিক যূথবদ্ধ সমাজের সময় থেকে আদি গ্রাম্যসমাজ পর্যন্তও তাদের প্রভাব ছিল অসীম। পরবর্তীকালের ভাবনাতেও চলতে থাকে এর প্রভাব। এই কারণে

আমি আমার গবেষণা ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছি। বিশেষত আমি মধ্যযুগীয় মুক্ত নগর রাষ্ট্রগুলোর আধুনিক সভ্যতার ওপর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি; এই বিষয়ে এ যাবৎকালে খুব কমই আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত, এই পারস্পরিক সহায়তা, যা কিনা মানব সমাজ অনেক বিবর্তনের ফলে গ্রহণ করেছে তা কেমনভাবে আজকের আধুনিক যুগেও প্রভাব ফেলছে তা দেখার চেষ্টা করেছি। আজকের যুগে যেখানে মূলমন্ত্রই হলো, "প্রত্যেকে কেবল নিজের জন্যে, আর সব কিছুর জন্যই রাষ্ট্র"—সেটা যে কখনই জিততে পারে নি এবং কখনও জিতবে না তাও দেখানোর চেষ্টা করেছি।

আমার এই ধারণার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ উঠতে পারে যে, আমি প্রাণিকুল ও মানব সমাজের, সামাজিক দিকগুলোর ওপর বেশি জোর দিয়েছি এবং তাদের স্বার্থপরতা বা সমাজবিরোধী প্রবৃত্তিগুলোর বিষয় সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছি। এটা আমি না করে পারি নি। আজকের দিনে আমরা "ভয়ানক এবং হৃদয়হীন বাঁচার জন্য লড়াই"-এর কথা এত বেশি শুনি, এবং এও শুনি যে, প্রতিটি প্রাণী অন্যান্য প্রাণীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, প্রতিটি আধুনিক নাগরিক প্রতিটি অন্য নাগরিকের বিরুদ্ধে অবিরত লড়ছে, তাই এটা না করে পারি নি। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের অন্য উপাদানগুলো তুলে ধরার প্রাথমিক প্রয়োজন তো ছিলই ; প্রয়োজন ছিল দেখানোর, কিভাবে সামাজিক চরিত্র বিবর্তনে অশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে এসেছে; দেখানো এই সহায়তা কিভাবে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় উন্নতমানের সুরক্ষা দিয়ে এসেছে। এই সহায়তা কিভাবে শীতের সময় অথবা দলবদ্ধভাবে স্থান ত্যাগের সময় খাদ্য সংগ্রহে সুবিধে করে দেয়, গড় আয়ু বাড়াতে সাহায্য করে এবং এর ফলে প্রাণীর বৌদ্ধিক মান বাড়াতে কিভাবে তা সহায়তা করে তাও দেখানোর প্রয়োজন ছিল। পারস্পরিক সহায়তার প্রাকৃতিক সূত্র নিয়েই এই বইটি, সহায়তাকে একটি মুখ্য উপাদান ধরে নিয়েই এই বইটি রচিত হয়েছে, বিবর্তনের সব উপাদান নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়নি। সব উপাদান নিয়ে আলোচনা সম্ভব করে তোলার জন্য আগে এই উপাদানটি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা মানব সমাজের বিবর্তনে কি ভূমিকা পালন করেছে তা বোঝার জন্য যে পরিমাণে গভীর অনুসন্ধান প্রয়োজন তা এখনও শুরু হয় নি। মানব জাতির ইতিহাসে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্পর্কে যে সংকীর্ণ, বুদ্ধিরহিত ধারণা ঐতিহাসিকরা যুগ যুগ ধরে 'নায়ক'দের সম্পর্কে দিয়ে এসেছেন তা আসল ইতিহাসের থেকে অনেকটাই ভিন্ন। ঐতিহাসিকদের বর্ণিত নায়কদের মধ্যেই ইতিহাস-সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বরা সীমাবদ্ধও নয়। যদি তেমন অবস্থা আসে তবে, ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা বিবর্তনের ওপর কিভাবে এবং কি প্রভাব ফেলে তাও দেখানোর চেষ্টা করব। এখানে আমি নিম্নলিখিত এক সাধারণ মন্তব্য করতে পারি : জনজাতি, গ্রামের গোষ্ঠীসমূহ বা মধ্যযুগের সব নগরসহ যে সব পারস্পরিক সহায়তার তন্ত্রগুলো ছিল, সেগুলো ইতিহাসের নিয়মে তাদের আদি চরিত্র হারাতে থাকে এবং ফলে প্রগতির পথে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুটি দিক থেকে মানব সমাজে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। একদল লোক এই সব অধঃপতিত তন্ত্রগুলোকে শুদ্ধিকরণ করে তার মধ্যেকার সহায়তার দিকগুলো ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে বা অন্য উন্নততর ব্যবস্থার কথা বলে। অন্য একটি দল সোচ্চারে বিদ্রোহের কথা বললেও আসলে সহায়তার সবটুকু ধ্বংস করে দিয়ে আত্মোন্নতি ও ব্যক্তিগত ধনসম্পদ এবং ক্ষমতা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে। এই বিদ্রোহী এবং দমিতদের মধ্যে সংঘাতের মধ্যেই ইতিহাসের ট্রাজেডি লুকিয়ে আছে। কিন্তু এই ব্যাপারে আলোকপাত করতে গেলে যতটা সময় নিয়ে আমি এই বইটি লিখেছি তার চেয়েও অনেক পরিমাণে সময় লাগবে।

প্রায় একই জাতের বিষয় নিয়ে যে সব বই আমার নজরে এসেছে তার মধ্যে ড্রামন্ড, ব্রুকনার, সাদারল্যান্ড-এর বই উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক বই হিসেবে গিডিং-এর বই-এর কথা বলতে পারি। অবশ্য আমার বই-এর সঙ্গে উল্লিখিত বইগুলোর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিচারের ভার রইল সমালোচকদের ওপর।

এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় *ঊনবিংশ শতাব্দী* নামক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। আগে আমি ভেবেছিলাম বইয়ের সংযোজনী হিসেবে বহু তথ্য সমাবেশিত করব; কিন্তু দেখলাম তাতে বই-এর কলেবর দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তাই আপাতত সেই সংযোজনী স্থগিত রেখে বর্তমান সংযোজনীতে বর্তমান সময়ের সামান্য কিছু বিতর্কমূলক তথ্য সংযোজন করেছি। বই আকারে প্রবন্ধগুলোকে সংকলন করার সময় সেই সব তথ্যই জুড়ে দিয়েছি যা বইটির মৌলিক গঠনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

অনুবাদ : **শুভাশিস মুখোপাধ্যায়**

গণবিজ্ঞান আন্দোলন : একটি আঞ্চলিক উদ্যোগ

অষ্টম দশক এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় নানা সমাজমনস্ক বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে ওঠে। এবং সমাজ জীবনে বিজ্ঞানের সুফল কুফল বিষয়ে নানারকম আলাপ আলোচনা থেকে আরম্ভ করে সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্যও এরা নানারকম উদ্যোগ নিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এসব কাজ যারা করছেন সেই সমস্ত বিজ্ঞান সংগঠন পারস্পরিক যোগাযোগ- সমন্বয়ের মাধ্যমে এই বিজ্ঞান চেতনাকে আন্দোলনের স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা যেমন করছেন তেমনি বিজ্ঞানের নান্দনিক দিককে মানুষের কাছে জনপ্রিয় করার তাগিদেও কাজ করছেন। এরকমই একটি সংগঠন 'হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদ'। 1983 সাল থেকে এরা ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছেন। এদেরই সাম্প্রতিক কাজকর্মের কিছু নিদর্শন আমাদের হাতে এল — জলাতঙ্ক বিষয়ে একটি লিফলেট, একটি পুস্তিকা, *সাপের কামড় এবং জলাতঙ্ক — পরিচয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা* বিষয়ে একটি আকর্ষণীয় শো-কার্ড। এছাড়া হেলবপ ধূমকেতু বিষয়ে সচিত্র পরিচয় জ্ঞাপক ফোল্ডার।

যে রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি সে রোগের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য দুনিয়া জুড়ে বহু অর্থ ব্যয় হয়ে চলেছে। কিন্তু যে রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে সে রোগে পৃথিবীতে বছরে কত কোটি মানুষ মারা যায়! আমাদের দেশে বছরে 30,000 লোক জলাতঙ্কে মারা যায়। জলাতঙ্ক নির্মূল করার ব্যাপারে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কাও যথেষ্ট উন্নতি করেছে। অথচ শ্রীলঙ্কার চেয়ে ভারত কতই না শক্তিশালী! অর্থাৎ বোঝা গেল দেশের শক্তিবৃদ্ধি হলেই দেশের লোকের উপকার হয় না। অন্তত কখনো কখনো উলটোটাও সত্যি!

যথাযথ সুযোগের অভাবে রোগ সারাতে মানুষ তাবিজ, কবচ ওঝার স্মরণ নেয়। তাই এর কুফলের কথা প্রচার করাই যথেষ্ট নয়, সঠিক চিকিৎসাও যাতে সকলে পেতে পারে তার জন্য এরা সচেষ্ট হয়েছেন।

'হালিশহর বিজ্ঞান পরিষদ' তাদের এলাকায় কুকুরে কামড়ানো মানুষের দুর্ভোগ প্রত্যক্ষ করেছেন, সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার মর্মান্তিক উদাসীনতায় মানুষকে মরে যেতেও দেখেছেন। বাসন্তী সাহাকে কুকুরে কামড়ানোর সাথে সাথেই নৈহাটির স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। চিকিৎসা(?)ও হয়েছিল এবং এক মাস দু দিনের মাথায় তিনি মারা যান বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে। এরই ফলে তারা জলাতঙ্ক পুস্তিকাটি প্রকাশ করেন। যদিও আগে থেকেই তারা এ বিষয়ে কাজ করেছেন। লিফলেট, সেমিনার, কুকুরকে নির্বীজকরণ এবং প্রতিষেধক দান শীর্ষক মডেল শিবিরেরও আয়োজন করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, সাপ ও সাপের কামড়, কুকুরের কামড় এবং জলাতঙ্ক শো কার্ডটি তারা স্থানীয় জেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শো-কার্ডটিতে কুকুরের কামড়ের প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে, দু একটি কথা বলেন নি। এক, ক্ষতস্থান বাঁধতে নেই এবং দুই, এটি ধোয়ার জন্য ডেটল, স্যাভলন বা অ্যালকোহল ব্যবহার করা যায়। সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে ছবি সহযোগে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়েছেন, কামড়ের দাগ দেখে কী করে বুঝতে হবে সাপটি বিষধর ছিল কীনা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা কী করা উচিত! ক্যানিং এর একটি সংগঠনও সাপের ওপর একটি আকর্ষণীয় শো-কার্ড বের করেছিল।

অথর্ববেদে জলাতঙ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়, জলা সন্ত্রাস রূপে। সে সময়ের মানুষ যথাযথ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করতেন র‍্যাবিজ আক্রান্ত কুকুরকে। একেবারে প্রথমেই এ তথ্য পরিবেশন করে পুস্তিকাটিকে তারা আকর্ষণীয় করেছেন। পুস্তিকাটি থেকে জানা গেল, প্রায় যে কোনো প্রাণী থেকেই এ রোগ হতে পারে ; কেবল কুকুরের কামড়ে নয় (যদিও 96 শতাংশ ক্ষেত্রে কুকুরের কামড়ই কারণ)। সেই প্রাণীটি র‍্যাবিজ আক্রান্ত ছিল কি না এটিই বিবেচ্য। যেমন র‍্যাবিজ আক্রান্ত মরা গোরু বা কুকুরের মাংস ধেড়ে ইঁদুর খেলে সেক্ষেত্রে তার কামড়েও জলাতঙ্ক হতে পারে। র‍্যাবিজ আক্রান্ত গোরুর কাঁচা দুধ খেলেও জলাতঙ্ক হতে পারে।

জীবাণু পরিচয়, সংক্রমণ ও সংক্রমণ প্রতিরোধ প্রক্রিয়া, রোগ লক্ষণ প্রাঞ্জলভাবে বোঝানো হয়েছে। সুলিখিত

পুস্তিকাটিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত 'ক্ষতের শ্রেণী বিভাগ ও ক্ষতের চিকিৎসা' ছকটি একটু দুর্বোধ্য ঠেকেছে। সেটা কি অনুবাদ যথাযথ হয় নি বলে?

জলাতঙ্কের ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার গুরুত্ব অপরিসীম। রোগী নিজে বা তার আশপাশের মানুষরাও এটা করতে পারে। পেরেক ফুটে গেলে অনেক সময় দেখেছি ক্ষতে বারুদ ঠেসে আগুন জ্বালিয়ে দিতে। এভাবে বোধহয় জীবাণু মেরে চিকিৎসা করা হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু সেটি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কারণ এতে ক্ষত বেড়ে যাবে। এবং জীবাণুর স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। র‍্যাবিজ ভাইরাস একবার স্নায়ুতন্ত্রে ঢুকে পড়লে আর কিছু করার থাকে না, তাই কুকুরে কামড়ানোর সাথে সাথেই প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে বইটিতে একবার বলা হয়েছে, কামড়ানোর দশ দিন পরেও কুকুরটি বেঁচে থাকলে চিকিৎসা চালানোর প্রয়োজন নেই, আবার বলা হয়েছে কামড়ানোর পনেরো দিন বাদেও প্রাণীটি সুস্থ থাকলে চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা জানতে চাই, আক্রমণের দশ-পনের দিনের মধ্যে আক্রমণকারী প্রাণীটি মারা না গেলে কি ধরে নেওয়া যাবে যে, আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে র‍্যাবিজ প্রবেশ করে নি?

সমস্ত সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিষেধক পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও এমনকি চিকিৎসার পরেও রোগী মারা যাওয়ার ঘটনা বিরল নয়। ভেজাল কোথায়? ওষুধে, না কি যারা ওষুধ দিচ্ছেন সেই মানুষে? সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাতে প্রতিষেধক থাকে সে জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝে মানুষ সংগঠিত হবে এমন আশা এরা করেন এবং সেজন্য উদ্যোগও নিচ্ছেন। এরকম আন্দোলনের ফলেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোথাও কোথাও আজ সফলভাবে সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে।

সরকারের কাছে দাবিপত্র পেশ করার অভ্যাস আমাদের বহুদিনের—প্রয়োজনের চেয়ে হাসপাতাল কম, ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই....। কিন্তু এও তো সত্যি, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মধ্যেও রয়েছে এমন বহু লোক যারা মানুষকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান অর্থ এবং প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য। স্বাস্থ্য আন্দোলনের ফলে এদের বাধাও অতিক্রম করা যাবে আশা করা যায়।

জলাতঙ্ক নির্মূল করার লক্ষ্যে ছটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বইটিতে। চতুর্থ প্রস্তাবটি 'বেওয়ারিশ কুকুর নিধন'। কেন? এটি সবচেয়ে সহজ বলে? বেওয়ারিশ কুকুর অর্থাৎ যে কুকুরের মালিক নেই। গ্রামাঞ্চলে দেখেছি, সব কুকুরের ঠিক মালিক আছে, এমন না। কিন্তু সব কুকুরেরই মোটামুটি একটা থাকা খাওয়ার জায়গা, পরিচয় থাকে—কোনো গৃহস্থ বাড়িতে অথবা পাড়ার মধ্যে। পথের কুকুর বা পরিচয়হীন কুকুরের দেখা সেখানেও পাওয়া যায় তবে বাজার এলাকায়। যাদের জীবন মৃত্যু দুই-ই বড় কষ্টের, অন্তত প্রায়শই। শহরে বাজারে মানুষই অপরিচয়ের আড়ালে তলিয়ে যায় সুতরাং মালিকহীন কুকুরের অবস্থা সেখানে যে বিশেষ ভালো হবে না তা জানা কথা। তাই, যে নাগরিক ব্যবস্থার কল্যাণে বেওয়ারিশ কুকুর তৈরি হয় তার সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পঞ্চম প্রস্তাবে এঁরা বলেছেন স্থানীয় প্রশাসন (পৌরসভা, গ্রাম-পঞ্চায়েত)কে বেওয়ারিশ কুকুরকে রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রস্তাবটি সুন্দর মনে হয়েছে। প্রস্তাবটিতে তারা আরো বলেছেন, 'বেওয়ারিশ বা রাস্তার কুকুরের কামড়ে যদি কোনো নাগরিক জলাতঙ্কে মারা যায়, তবে প্রশাসন সেই মৃতের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে'।

পুস্তিকাটির একদম শেষে বলা হয়েছে—'রোগ প্রতিরোধের জন্য অসহায় মানুষ দ্বারস্থ হয় ওঝা, গুনিন, জানগুরু, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, আয়ুর্বেদী, হেকিমি, ইউনানি, থালাপড়া ইত্যাদির দোরগোড়ায়। ফলে হিতে বিপরীত হয়। এবং বলা হয়েছে উপরোক্ত কোনো চিকিৎসা পদ্ধতিই বিজ্ঞান-সম্মত নয়, এগুলোর ওপর ভরসা করে মৃত্যুর দিকে একধাপ এগিয়ে যাবেন না।'

জলাতঙ্কের ক্ষেত্রে উপরোক্ত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু কোনো কোনো রোগে এর কোনো কোনো পদ্ধতি মানুষ ব্যবহার করেন, রোগও সারে। কিভাবে সারে তার বৈজ্ঞানিক কারণ জানা না থাকলেও এভাবে ওঝা, গুনিন জানগুরু, থালাপড়া....র সাথে সবগুলিকে মিলিয়ে দেওয়া সঙ্গত হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং এগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করা উচিত।

সবশেষে বলি, বইটিতে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হলে ভালো হতো। কিছু কিছু মুদ্রণ-প্রমাদও নজরে পড়েছে।

বলাই

মতামত

সম্পাদক, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

বি ও বি, জানুয়ারি-মার্চ 1996 সংখ্যাটি হাতে এসেছিল বেশ দেরিতে। অমিতাভ বসু রায়ের "দেবতার ব্যাধি" লেখাটি পড়ে তাঁকেই একটি চিঠি পাঠাই। কিছু রদবদল করে তারই একটি অনুলিপি আপনাদের দপ্তরে পাঠালুম। হয়তো এটিকে দিয়ে একটি বিতর্কের সূচনা হতে পারে।

শুভেচ্ছান্তে—

প্রসঙ্গ : "দেবতার ব্যাধি"

বড় বেশি সাধারণীকরণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আপনার লেখাটি। কয়েক হাজার বছরের বিশ্ব-ইতিহাস থেকে আপনি একটা নির্যাস বার করার চেষ্টা করেছেন। ফলে, মাঝেমধ্যে বিশাল ফাঁক রয়ে গেছে।

যেমন ধরুন, নান্দনিক বোধের সর্বজনীন চরিত্র, বাস্তবে এর উল্টোটাই সত্যি। নান্দনিক বোধও দেশ-কাল-পরিস্থিতি নির্ভর। ভারতের মার্গসংগীত ইওরোপীয়দের কানে মধুর লাগে না; ব্যালে নাচ দেখে কত্থক-শিল্পী বলেন : এ তো স্রেফ অ্যাক্রো-ব্যাটিক্স্। সব শিল্পে (এমনকি সবচেয়ে বিমূর্ত—রেখা-রঙ ও সুরে) সকলের ঝোঁক, বা সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না।

কিছু তথ্য নিয়েও প্রশ্ন আছে। বুদ্ধ কোথায় জগৎকে 'মায়া' বললেন? জ্ঞানের বিকাশে বিশ্বাস করতেন শ্রীচৈতন্য—এর প্রমাণ কোথায়? 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' (হওয়া উচিত : সত্যং শিবং সুন্দরম্)—এই মহাবাক্য কোন্ উপনিষদে আছে? ভারতীয় দূরদর্শন-এর লোগোতে থাকলেও এটি আদৌ ভারতীয় ধারণা নয়। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ এটি পছন্দ করতেন না। The true, the good, and the beautiful—এর সমাহার ঊনিশ শতকের ইওরোপে প্রথম দেখা দেয়।

সব উপনিষদে একটিই মাত্র চিন্তার নজির রয়েছে, আর সেটি হলো ব্রহ্মজ্ঞান—এটিও বৈদান্তিকদের প্রচার মাত্র। *ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক* ও আরও পরের *শ্বেতাশ্বতর* ও *মৈত্রী* উপনিষদে বরং বহু বিরোধী চিন্তার সন্ধান মেলে। যাজ্ঞবল্ক্যর মতো ভাববাদীর পাশে সেখানে দেখা দেন উদ্দালক আরুণি—পর্যবেক্ষণপরীক্ষণ করেই যিনি 'অণিমা'-র ধারণায় পৌঁছন। পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানী বলে ধরা হয় খ্রিস্টপূর্ব ছ শতকের দার্শনিক, মিলেটাস-এর থালেস-কে। কিন্তু উদ্দালকের দাবি আরও বেশি। তিনি অন্তত খ্রিস্টপূর্ব সাত শতকের লোক।

বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কেও আপনার ধারণা খুবই ইওরোপ-কেন্দ্রিক। প্রথাগত বিজ্ঞানের জন্ম অন্তত তিন হাজার বছর আগে। জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র (তার সূত্রে শারীরবিদ্যা, জীববিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা)—এগুলোর উৎপত্তি হয়েছে ব্যাবিলন, মিশর, ভারত ও চীনে, পাহাড়-সমুদ্র ডিঙিয়ে তার জ্ঞান পৌঁছেছে এক দেশ থেকে অন্য দেশে (মুখ্যত আরবদের মারফত)। চীন-বিশেষজ্ঞ জোসেফ নীডহাম তাই স্লোগান তুলেছিলেন : 'আধুনিক সর্বজনীন (universal) বিজ্ঞান, হ্যাঁ, ইওরোপীয় বিজ্ঞান, না!'

আর গণিতভিত্তিক যুক্তি পদ্ধতিই কি আধুনিক বিজ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি? আবার নীডহাম-এর মন্তব্যই মনে পড়ে :

> What I do want to say is that modern exact and actual science is something much greater and wider than Euclidean geometry or Ptolemaic mathematical astronomy : more river than these have emptied into the sea. For anyone who is a mathematician and a physicist, perhaps a Cartesian, this may not be welcome : but I myself am professionally a biologist and chemist, more than half a Baconian, and I therefore do not think that what constituted the spearhead of the Galilean breakthrough constitutes the whole of science.

এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক, আধুনিক বিজ্ঞান কোনো নীতিবোধের জন্ম দিতে পারে নি; ধর্ম (বা বেদান্ত-র মতো দর্শন) তা পেরেছিল—এই তো আপনার মত? ধর্ম যে নীতিবোধের জন্ম দেয় তার সবটুকুই কি আপনার আমার কাছে গ্রাহ্য? সাধুতা, অর্থ ও যশ-এর পেছনে না ছোটা, সত্যনিষ্ঠা—এ ধরণের কথা

অ-ধর্মী (secular) বা ধর্মবিরোধী লোকও বলেন, সেই মতো আচরণ করেন। তার বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমত (বিশেষত, ঈশ্বর, পরলোক, আত্মা ইত্যাদিতে যাদের বিশ্বাস আছে) বা নীতিবোধ শেখায় তা এখন, অন্তত আমার চোখে, অচল। খ্রিস্টধর্ম গোড়া থেকেই প্রভু-দাস সম্পর্কের নিত্যতা ও পুংপ্রাধান্যকে মেনে নিতে বলেছে (সন্ত পল-এর পত্রাবলি); আর হিন্দুধর্ম (ব্রাহ্মণ্যধর্ম)-র সঙ্গে জাতিভেদ (বর্ণপ্রথা), কর্মফল, জন্মান্তর ইত্যাদি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। 'ছান্দোগ্য-উপনিষদ্'-এই তার প্রমাণ মেলে, পুরাণ অবধি অপেক্ষা করতে হয় না। মনু প্রমুখের ধর্মশাস্ত্র শুরুই হয় মানুষের অসাম্য থেকে : একই অপরাধে এক-এক বর্ণের এক-এক শাস্তির (ব্রাহ্মণ হলে লঘু, শূদ্র হলে গুরু) ব্যবস্থা।

অন্যদিকে, প্রাচীন বিজ্ঞানের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্র নিঃসন্দেহে নীতিবোধের সঙ্গে যুক্ত। *চরক-সংহিতা* ও হিপ্পোক্রাতেস-এর শপথই তার প্রমাণ। শ্রমহারক যন্ত্রগুলি মুনাফার জন্যে তৈরি হয় নি, মানুষের কাজের সুবিধে করাই ছিল তার লক্ষ্য। তখন পেটেন্ট ছিল না। পাইকারী হারে হুইল-ব্যারো বা ঘটযন্ত্র তৈরির কারখানাও না। যাঁর দরকার, কারিগর দিয়ে তিনি এগুলো তৈরি করিয়ে নিতেন।

সমস্যাটা ঠিক কোথায়? পুঁজিবাদ আর আধুনিক বিজ্ঞান একই লগ্নে জন্মেছে, পরস্পরকে আশ্রয় করেই তারা চলেছে। পুঁজির সঙ্গে নীতির কোনো যোগ নেই —মুনাফা থেকে অতিমুনাফাই তার একমাত্র লক্ষ্য। তার দৌলতে মানুষের যেটুকু উপকার হয়, তা ঐ তাড়নারই উপজাত (by product) মাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানও সেই পুঁজিবাদের প্রভাবেই নীতিহীন — a-moral ।

পৃথিবীর বহু দেশে সমাজবাদ আপাতত পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনের মধ্যে টিকতে গিয়ে তারও চরিত্র ভ্রষ্ট হয়েছিল। এই মুহূর্তে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে অপারগ। কিন্তু ইতিহাস তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। পরের পর্ব শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত অনেক গুরুতর সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, দেবে। সেই সঙ্গে আবার নতুন নীতিবোধেরও বিকাশ হবে। সমস্যা হলো : নীতিবোধ তো শুধু খাড়া করলেই হয় না, তাকে প্রয়োগ করার মতো অনুকূল পরিবেশ চাই। ধর্ম থেকে পাওয়া নীতিবোধ আমাদের সমাজে কোন্ কাজে লাগছে? যারা আয়কর ফাঁকি দেয়, হাওলা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে থাকে, কালোবাজারি ও ভেজাল দেওয়াই যাদের পেশা—তারা কেউই অ-ধর্মী ধর্মবিরোধী নয়, বরং প্রায় সবাই-ই অসম্ভব ধর্মপ্রাণ; জ্ঞানত যে পাপ তারা করে তা কাটানোর জন্যে নিয়মিত পুজো আচ্চা, খটমল খাওয়ানো, মন্দির স্থাপন, তীর্থ-দর্শন ইত্যাদিও চালিয়ে যায় (পরশুরামের "শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" গল্পে এর 'দর্শন'টি চমৎকার হাজির করেছে গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া)।

নীতি-অনীতি, ভালো-মন্দ—এর নিরিখটা কী হবে? নরকের ভয়, না মানুষের (বা পৃথিবীবাসীর) মঙ্গল? যদি দ্বিতীয়টা ধরেন, তাহলেও প্রশ্ন উঠবে : কোন্ মানুষের? চোর-ঘুষখোর অস্ত্র ব্যবসায়ী—এদেরও মঙ্গল? যারা লোককে না খাইয়ে মারে, রাষ্ট্রক্ষমতার দালালি করে তাদের না দাবিয়ে তো নিরীহ লোকদের ভালো করা যাবে না।

মুশকিল হচ্ছে, উদ্দেশ্য মহৎ হলেই উপায়টাও আপ্‌সে মহৎ হয়ে যায় না। স্বদেশী ডাকাতি করতে করতে অনেকে স্রেফ ডাকাতই হয়ে যান। গোপন আন্দোলনে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে-থাকতে অন্য নৈতিক অধঃপতনও ঘটে। আমাদের জাতীয় বিপ্লবীদের স্মৃতিকথায় তার নমুনা পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানের জগৎ থেকেই অ-ধর্মী নীতিবোধ জন্মাবে—এমন আশা করা শক্ত। নীতিবোধ তো শুধু বিজ্ঞানের জগতের ব্যাপার নয়। বৃহত্তর সমাজজীবনেই তার আসল ভূমিকা। ব্যাপক অর্থে এক দুর্নীতির (শুধু আর্থিক নয়) পরিবেশে আমরা বেঁচে আছি। তার চাপ পুরোপুরি কেউই এড়াতে পারবেন না।

সুতরাং ঘুরে ফিরে সেই পুরনো কথাটাই আসে : সমাজের চেহারা না-বদলালে নীতিবোধের জাগরণ সম্ভব নয়। বের্টল্ট ব্রেশট-এর *সেৎসুয়ান-এর ভালোমানুষ* আর *গ্যালিলেও-র জীবন* দুটি নাটকই একই সমস্যার এপিঠ ওপিঠ তুলে ধরে।

অনুগ্রহ করে ভুল বুঝবেন না। সমাজে দুর্নীতি আছে, অতএব প্রতিটি মানুষই দুর্নীতিগ্রস্ত এমন অনাস্থাশীল (cynical) কথা আমি বলছি না। বলছি মাত্রাভেদের কথা। সচেতন ও সক্রিয়ভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বা নীতিজ্ঞানহীন মানুষই সংখ্যাগুরু—ঘটনা এমন নয়। আমি যাঁদের দেখি, চিনি, জানি, তাঁদের বেশির ভাগই একটা মাঝামাঝি জায়গায় থাকেন—অভাবে কারও কারও স্বভাব নষ্ট হয়, কারও হয় না; কেউ বা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখলেই আরও বেশি স্বচ্ছলতার পেছনে ছোটেন, অল্পস্বল্প বেআইনী কাজও করেন। তেমনি কেউ কেউ আছেন যাঁরা বিয়েতে পণ দেন না, কিন্তু সপ্তপদীতে আপত্তি নেই—যদি তাতে পারিবারিক অশান্তি এড়ানো যায়। পরিবেশ অনুকূল হলে—পরিবার ও রাষ্ট্র-র চাপ কম থাকলে—এঁরাও জীবনের

সবক্ষেত্রেই বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিতে পারতেন। চন্নামেত্তো খেলে রোগ সারে—এমন বিশ্বাস এখন অল্প লোকেরই আছে, কিন্তু যাঁর ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই তাঁকে সেই ঝাড়ফুঁক জলপড়ারই শরণ নিতে হয়।

কিছু মানুষই এই পরিবেশ তৈরি করেছে, অন্য কিছু মানুষই তা বদলাতে পারে। এই মুহূর্তে তার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু সম্ভাবনা তো থাকেই। এর মধ্যেও কিছু ব্যক্তি—বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী—নিজের মতো সৎভাবে বেঁচে আছেন ও থাকবেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা কোনো উপকারে লাগছেন না। কিন্তু এরও একটা সুফল আছে। সংখ্যায় কম এই ব্যতিক্রমী মানুষরাই নীতিবোধকে বাঁচিয়ে রাখেন; পরের প্রজন্মের কাছে জোগান দেন জীবনযাত্রার এক বিকল্প ধরণ।

সমাজের সব স্তরে বিজ্ঞানচেতনা ও নীতিবোধ সমানভাবে ছড়াবে—এমন আশা করে লাভ নেই। কিন্তু, ব্যক্তি হিসেবে—হ্যাঁ, *ব্যক্তি*হিসেবেই—আপনি-আমি চেষ্টা করতে পারি : নিজের জীবনযাত্রাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্বাহ করতে। আহার-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যা যাঁদের নেই (আমাদের পেশায় কাউকেই দিন-আনি-দিন-খাই করে বাঁচতে হয় না), তাঁরা অন্তত বিরত থাকতে পারি গড্ডলিকাপ্রবাহে যোগ দেওয়া থেকে ;টাকা করার চেয়ে বড় করে দেখতে পারি পরার্থপরতাকে ;আত্মসর্বস্বতা থেকে মুক্ত হতে পারি; অ-নীতিমূলক কাজের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে পারি—অন্তত নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারি ধান্দাবাজি থেকে।

নিজের জীবনে তা করা সম্ভব হলে তবেই আমরা প্রচার করতে পারি নীতিনিষ্ঠ বিজ্ঞানমনস্ক জীবনদর্শন। সকলেই আমার সঙ্গে একমত হোন—এমন দাবি না করে, আমি বরং চাইব—যা করছেন তা ভেবে করুন ;অন্যরা যা করছে আমাকেও তাই করতে হবে—এই ভাবনাটা অন্তত ছাড়ুন। শুধু নিজের শ্রীবৃদ্ধির কথা ভাববেন না, আপনার চেয়েও যারা অনেক খারাপ অবস্থায় আছেন, তাঁদের কথাও ভাবুন।

আগেই বলেছি, নীতিবোধ সঞ্চারিত করতে গেলে, তার অনুকূল পরিবেশ দরকার। বন্ধ হওয়া চাই শোষণ, দূর হওয়া চাই দারিদ্র্য। কিন্তু সেই পরিবেশ তৈরি করতে হলে সমাজ ও বিজ্ঞান—দুএরই সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। প্রতিটি মানুষের যেমন ভৌতবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা দরকার, তেমনি বিজ্ঞানীদেরও সমাজবিকাশের ধারা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। আবছাভাবে 'মানুষের মঙ্গল'-এর কথা না বলে, আরও মূর্ত, concrete নিরিখে বুঝতে হবে কোন্ মানুষের মঙ্গল। 'মঙ্গল' বলতে ঠিক কী বোঝাতে চান—সেটাও খুলে বলুন। জৈব জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধে ছাড়া আরও কী কী?

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

□□

সমালোচনার উত্তর

বি ও বি তে প্রকাশিত আমার "দেবতার ব্যাধি" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে শ্রী রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাকে নির্দিষ্ট কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত লেখার ধরণ সম্পর্কে সমালোচনা 'বড় বেশি সাধারণীকরণের' প্রবণতায় আমার উক্ত প্রবন্ধে অনেক ফাঁক রয়ে গেছে। দুই তথ্যগত ভ্রান্তি, যেমন সত্যং শিবং সুন্দরম্ এই উক্তিটির উৎস বিষয়ে। তিন, কিছু ধারণাগত ভ্রান্তি-র মধ্যে আছে—উপনিষদ বিষয়ে ধারণা, বুদ্ধদেবের চিন্তায় মায়ার ধারণা, শ্রীচৈতন্যের ভাবনায় জ্ঞানের স্থান ইত্যাদি। চার, আমার কিছু সিদ্ধান্তের যথার্থতা বিষয়ে সংশয়, যেমন নান্দনিক বোধের সর্বজনীন চরিত্র, গাণিতিক যুক্তিপদ্ধতিকে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে মনে করা। পাঁচ, কিছু দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রশ্ন —যেমন বিজ্ঞানের ইতিহাসকে ইওরোপকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে দেখা। সবশেষে শ্রীভট্টাচার্য সমাজ জীবনে চারিদিকের ভ্রষ্টাচারের মধ্যে ব্যক্তি হিসেবে কিভাবে আমরা জীবনযাপন করতে পারি সে-বিষয়ে কিছু মতামত ব্যক্ত করেছেন।

"দেবতার ব্যাধি" প্রবন্ধে আমি বলবার চেষ্টা করেছি যে, জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা নেয়। এই পরিবর্তন মানুষের জীবনযুদ্ধকে সহজতর করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, এই পথে মানুষ জ্ঞানের শক্তিকেও উপলব্ধি করে এবং এই জ্ঞান শাসক শ্রেণীর হাতে শাসিত মানুষকে দমিয়ে রাখার শক্তি যোগায়। যুগে যুগে আমরা এই রূপ দেখতে পাই যার ফলে জ্ঞানের বিকাশের সাথে সাথে মানবজীবনের যে পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল তা কিন্তু হয় না। এ কারণেই, বিভিন্ন যুগেই যে জ্ঞানের শক্তিকেই শাসকশ্রেণীরা বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল সে

কথা বোঝাবার জন্য এক ধরণের সাধারণীকরণের প্রচেষ্টা নিয়েছি। এই চিন্তায় কিছু ফাঁক থেকে যাওয়া অসম্ভব নয় বরং স্বাভাবিক। তবে আমার বিশ্বাস আলোচনার মাধ্যমেই এই ফাঁক ভরাট বা ত্রুটি সংশোধন সম্ভব।

দ্বিতীয় ভাগের প্রশ্নের জবাবে জানাই যে শ্রীভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন, সত্যং শিবং সুন্দরম এই শব্দত্রয় উপনিষদে নেই। আমার ধারণা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম বাংলায় কথাটি এমনভাবে ব্যবহার করেন এবং তাও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় দার্শনিকদের প্রভাবে। আমি সজ্ঞানেই এই শব্দত্রয় ব্যবহার করেছি কারণ এইভাবে উপনিষদের ব্যাখ্যা অনেকেই করেছেন এবং আমার তা সঠিক মনে হয়েছে, যদিও ভ্রান্তি বশত উদ্‌ধৃতি চিহ্ন পরে যাওয়ায় এই ভুল প্রকট হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে এবং পরবর্তী দর্শনালোচনায় আমি যে যুক্তি পদ্ধতির ব্যবহার করেছি তা একটু বলে নিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণে দার্শনিকরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন তাকে মূলত দুভাগে ভাগ করা যায়। কিছু দার্শনিক অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পারিপার্শ্বিক জগতকে কিছু নিয়মের গণ্ডিতে বাঁধবার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। আর অন্য অনেকে এই বিচারে ঘটনা অপেক্ষা, ঘটনা মানব মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার মধ্য দিয়ে সত্যকে জানবার প্রচেষ্টা নিয়েছেন। এইভাবে ঘটনার বিশ্লেষণে বস্তুগত ও ভাবগত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এই দুই দর্শনধারা মানুষের জ্ঞানার্জন পদ্ধতির এক দ্বৈত চরিত্রকে প্রকাশ করে। বাহ্যিক জগৎ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান বস্তুগত বিচারে বিশ্লেষণ করা যায় অথচ এই বিচার মানুষের অন্তর্জগতের বিচারে কোনো ভূমিকা নিতে পারে না। যুক্তি পদ্ধতির সাহায্যে বাহ্যিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা করা যায়, সে-কারণে বাহ্যিক জগতের বিচারের মধ্য দিয়ে সত্যকে জানবার প্রচেষ্টাই দর্শনের বস্তুবাদ। অন্যদিকে ভাববাদী বিচারে কার্যকারণ সম্পর্ক আপাত সত্য নয় কারণ ঘটনা এবং মানব মনে তার প্রতিক্রিয়া প্রায়শই সরল সম্পর্ক বজায় রাখে না। সে কারণে ভাববাদী বিচারে সত্যকে এক ধরণের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে জানা যায়। উপলব্ধি শূন্যে গড়ে উঠতে পারে না, সুতরাং ভাববাদ প্রায়শই জগতের এক ধরণের রূপকল্প ধরে নেয়।

উপনিষদে এই দ্বৈত বিচারের স্বীকৃতি আছে। উপনিষদীয় দর্শনে জ্ঞানকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে : পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। এখানে পরাবিদ্যা যা পরমপুরুষকে জানা (ভাবগত দিক) এবং অপরাবিদ্যা প্রকৃতিকে জানা (বস্তুগত)। এই বিজ্ঞান অ্যারিস্টটলের প্রাথমিক দর্শন (ঈশ্বরতত্ত্ব) এবং দ্বিতীয় দর্শন (পদার্থবিদ্যা)-এর মতোই। এবং এই দুই দর্শন মতেই, পরাবিদ্যা বা ঈশ্বরতত্ত্বকে শ্রেয় মনে করেছে যদিও অ্যারিস্টটল মনে করতেন দ্বিতীয় দর্শনের বিকাশের মধ্য দিয়েই প্রাথমিক দর্শনকে জানা সম্ভব। এখানেই উপনিষদের মতবাদের সাথে এর প্রভেদ। উপনিষদ এই দুই বিচারের মধ্যে এক ধরণের সামঞ্জস্যের সন্ধান করেছে। *কঠোপনিষদে* (2/1/3) বলা হয়েছে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধে মণ্ডিত বিশ্বের যে পরিচয় আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় এনে দেয়, তা বিশ্বসত্তা থেকে অভিন্ন। এখানে আমরা প্রায় অ্যারিস্টটলের কথা শুনছি বলে মনে হয়। কিন্তু উপনিষদ সাথে সাথেই বলেছে (*কঠ* 2/3/9) পরম সত্তাকে জানা যায় যদি কোনো মণীষী তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেন। এভাবে বস্তুগত ও ভাবগত বিচার বুদ্ধির সমন্বয়ই সত্য সন্ধানের পথ। এই সামঞ্জস্যের উপলব্ধি কেবলমাত্র নান্দনিক বোধের দ্বারাই সম্ভব। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি'। যা কিছু সত্য তা তার আনন্দরূপ, তার অমৃতরূপ। সত্য আর সৌন্দর্য যেন একীভূত।

রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে বলেছেন 'সৌন্দর্য্যের কাজ প্রকৃতির উদ্দেশ্যকে জানানো নয়—অনুভব করানো'। এখানেই শেষ নয় উনি আরও বলেছেন 'সৌন্দর্য্য একধরণের সামঞ্জস্যের কথা বলে যার মধ্যে বিষম কিছু নেই। সে কারণে যথার্থ সুন্দরের মধ্যে প্রেমের স্বাদ পাওয়া যায়।' এভাবেই উপনিষদীয় চিন্তায় সত্য, সুন্দর আর প্রেমের এক মেলবন্ধনের কথা প্রথম শোনা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের আওতায় আসে এবং ভাবগত বিচার গুরুত্ব পেতে থাকে সে সময়ই আমরা 'সত্যং শিবং সুন্দরম' শুনতে পাই। এ কারণে এই সময় বহু পাশ্চাত্য মণীষী উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হন, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের যে এই বাক্যত্রয়ে আপত্তি ছিল তা আমার জানা নেই। এ প্রসঙ্গে আরও একটু বলা দরকার যে শ্রী ভট্টাচার্য উপনিষদে জাতিভেদের প্রসঙ্গ তুলে প্রশ্ন রেখেছেন, নান্দনিক বোধের বিকাশে এত ঘৃণা কেন? এ প্রসঙ্গে আমার মনে হয় উপনিষদীয় জ্ঞানতত্ত্বের সাথে তার সামাজিক দর্শনের এক বিষম সম্পর্ক আছে, যা তৎকালীন শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফল। উপনিষদগুলির বিচারেও তা প্রত্যক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। কারণ এখানেই তো দেবতার ব্যাধির শুরু।

গৌতমবুদ্ধের মায়া বিষয়ে যে প্রশ্ন শ্রী ভট্টাচার্য তুলেছেন

তা কিন্তু গৌতমবুদ্ধের আনন্দের প্রতি উপদেশ থেকেই নেওয়া। গৌতমবুদ্ধের সময় বৌদ্ধধর্মে [1] বিশেষ দার্শনিক চিন্তা ছিল না। কিছু নীতিবোধের কথাই ছিল। পরে এই ধর্মের প্রসারের জন্য এক ধরণের দার্শনিক ভিত্তির প্রয়োজন হয়।[2] মহাযান চিন্তাই মূলত প্রচারধর্মী বৌদ্ধধর্মের মূল শাখা এবং সেখানে মায়ার কথা আছে, যার মধ্যেই শংকরাচার্য্যের মায়ার মূল ভ্রূণ লুকিয়ে আছে বলে অনেকেই মনে করেন। বুদ্ধের মতে এই জীবন ও জগৎ দুঃখময়। জাগতিক বস্তু বা অনুভূতি মাত্রই ক্ষণস্থায়ী অতএব ক্লেশদায়ক। জীবের সকল দুঃখের কারণ তার জন্মগ্রহণ। বুদ্ধের মতে জগতের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য নির্বাণ লাভ করে। আয়ুষমান মোঘরাজ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন—'জগৎকে কিরূপে দর্শন করিলে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়?' বুদ্ধের উত্তর—'সদা জাগ্রতচিত্ত হইয়া জগৎকে শূন্যময় নিরীক্ষণ কর। এই প্রকারে আত্মানুদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যু উত্তীর্ণ হইবে।'

বুদ্ধ আরও বলেন 'সব্বং বিতথং ইদং।' (এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ মিথ্যাই।)[3]

মহাযান বৌদ্ধধর্মের এই জগৎ মিথ্যার ধারণা শংকরাচার্য্যের মায়াবাদে পূর্ণ রূপ পায়। শংকরাচার্য্য বস্তুগত বিচারকে অস্বীকার করেন এবং 'জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য'কেই উপনিষদের মূল বক্তব্য বলে মনে করেন। শ্রীচৈতন্য শংকরের এই চিন্তাকে ভ্রান্ত মনে করেন।

'উপনিষদে সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যাবৃত্তি সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব।
গৌণাবৃত্তে যে ব্যাখ্যা করিলা আচার্য্য।

(*চৈতন্য চরিতামৃত*)

শ্রীচৈতন্যের দর্শনচিন্তা অচিন্ত্যভেদাভেদে উপনিষদীয় দর্শনের এক নতুন ব্যাখ্যা দেন, যার মধ্যে জ্ঞানের সাথে নান্দনিক বোধের বিকাশ জড়িত হয়।

চতুর্থভাগে শ্রী ভট্টাচার্য যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত নান্দনিকবোধ সর্বজনীন কি না? এবং দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অংকশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে কি না? আমি আগে এই দ্বিতীয় প্রশ্ন ও পঞ্চম ভাগে উত্থিত 'বিজ্ঞানের ইতিহাসকে ইওরোপকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে দেখা'র, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।

শ্রী ভট্টাচার্য ঠিকই বলেছেন যে, কার্যকারণ সম্পর্কে মানুষ যেদিন প্রথম অবহিত হলো বিজ্ঞানের সূচনা সেদিন থেকেই। আধুনিক বিজ্ঞান কিন্তু তা থেকে আলাদা। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন কোনো বিষয়কে অনুধাবন করবার চেষ্টা করি, সেই বিষয়টির গুণগত রূপই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞানের জন্মকালে যুক্তিপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল এই গুণগত রূপকে ধরে নিয়ে তার কার্যকারণ বিচারের মধ্য দিয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয় দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে

এক : স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ এক কার্য্যকারণ সম্পর্কের সন্ধান।

দুই : গুণগত বিচারকে সংখ্যাগত বিচারে পরিণত করা।

অংকশাস্ত্র-নির্ভর যুক্তিপদ্ধতিই এই দুটি বিষয়কে ফলপ্রসূ করে তুলতে সাহায্য করেছে। ইওরোপ বা এশিয়া নয়, বিশ্বময় যে বিজ্ঞানের প্রসার তা অংকশাস্ত্রের অন্তর্গত। কারণ অংকশাস্ত্র ছাড়া স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ অন্য কোনো যুক্তি পদ্ধতি নেই। অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে মূলত পদার্থবিদ্যাকে ঘিরে যা কি না জড় পদার্থের ধর্ম। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন থেকে মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানের আওতায় আনার প্রচেষ্টা নেওয়া হলো বা তারও পরে জীববিদ্যাকেও যখন বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা হলো তখন থেকেই অনেকের মনে এ প্রশ্ন জেগেছে যে, বিজ্ঞানে অংকশাস্ত্রের বাইরেও কিছু আছে। আসলে চেতন পদার্থের জটিলতা বা মনোবিদ্যার গূঢ় রহস্যই এ জাতীয় চিন্তার কারণ। নীডহামের মনেও এ প্রশ্ন জেগেছে। নীডহাম অংকশাস্ত্র বহির্ভূত বিজ্ঞানের কথা অনুভব করেছেন কিন্তু তার রূপরেখা বিষয়ে কিছু বলতে পারেন নি কারণ অন্য কোনো যুক্তি পদ্ধতি জানা নেই যা একদিকে সর্বজনীন অন্যদিকে দেশ কাল পাত্র নিরপেক্ষ।

এই রকম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছে নান্দনিকবোধ সর্বজনীন যদিও সাধারণভাবে এই সর্বজনীনতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, 'জগতের সাধারণের সহিত সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। জগতের সর্বত্রই তাহার তুলনা বা দোসর মেলে।' এই জন্য সৌন্দর্য্য সকলের ভালো লাগে, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবোধ সর্বজনীন তবে একই বস্তুকে সকলে সুন্দর দেখব কিনা তা বলা যায় না। আশাকরি এ বিষয়ে শ্রী ভট্টাচার্যও একমত হবেন। অংকশাস্ত্র যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ প্রভৃতি কিছু সরল প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠলেও, এ-পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে জটিল হয়েছে, ফলে সর্বজনবোধ্যতা হারিয়েছে। যেহেতু অংকশাস্ত্রের বিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা, এ শাস্ত্রের সর্বজনীনতা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না। নান্দনিক বোধের ক্ষেত্রে এ-কথা

খাটে না। নান্দনিক অভিজ্ঞতা মানুষের মনে এক ধরণের আবেগ সৃষ্টি করে যার প্রকাশ আনন্দ বা বেদনায়। এই আবেগের গুণগত রূপকে সংখ্যাগত রূপে পরিণত করার পন্থা আমাদের জানা নেই। নান্দনিকবোধের সাথে জড়িত হয়ে থাকে এক ধরণের উপলব্ধি। এই উপলব্ধিকে স্থান কাল পাত্র নিরপেক্ষ করতে উপনিষদ নীতিবোধের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা দেখি, উপনিষদে জ্ঞানী মানুষ নিষ্কাম, সক্রোধী, স্থিতধী প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত। পাঁচশ বছর আগে যেমন বস্তুগত বিচারের ভাষা হিসেবে অংকশাস্ত্র গড়ে উঠেছে, আজ মনে হয় ভাবগত বিচারের একটি ভাষা সৃষ্টিই দার্শনিক বা বিজ্ঞানীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রী ভট্টাচার্য বলেছেন, আমাদের মার্গসংগীত ইওরোপীয়দের কানে মধুর লাগে না। মার্গসংগীত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট রাগ। সুতরাং সে রাগের অনুধাবনে তো এক পদ্ধতির মধ্য দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু কোকিলের কুহুতান, পূর্ণিমার চাঁদের রূপ তো সর্বজনীন। আমার অভিজ্ঞতায় (নিশ্চিতভাবে সীমিত) এক দেশের লোকসংগীত কিন্তু অন্য দেশেও আদরণীয় হয়। অবশ্যই এ বিষয়ে আরও গভীর অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

সবশেষে শ্রী ভট্টাচার্য-র অভিযোগ যে আমি ধর্মীয় নীতিবোধকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি। আমি গুরুত্বপূর্ণ বলেছি, তা কিন্তু এক হিসাবে সঠিক যেহেতু বিজ্ঞান মানুষের অন্তর্জগতের বিশ্লেষণে আজও সফল নয়, সে কারণে মানুষের মনে 'বিজ্ঞান বহির্জগতকে জানবার পন্থা এবং ধর্ম আত্মানুসন্ধানের পথ'-এ ধরণের এক বিশ্বাস আছে। যেহেতু নীতিবোধ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাসের সাথে জড়িয়ে থাকে তাই নীতিবোধে ধর্ম এত গুরুত্ব পায়। ধর্মীয় নীতিবোধের সংস্কার থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হলে জাতি-ধর্ম-নিরপেক্ষ এক নীতিবোধের প্রসারে বিজ্ঞানীদের ব্রতী হতে হবে। আর তা করতে হলে মানুষের মনোজগতের বিচারকেও বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে পত্রলেখক শ্রীভট্টাচার্য নীতিবোধ বিষয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। তার জের টেনে বলা যায় বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রের বিকাশ তো একসাথে হবেই, কারণ বিজ্ঞানই তো ধনতন্ত্রের জন্মদাতা। বিজ্ঞানের বিকাশই মানুষকে উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়েছে। শেষ করার আগে নীতিবোধের জের টেনে শ্রী ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত জীবনের যে নৈতিকতার কথা বলেছেন সে বিষয়ে আমি দ্বিমত নই। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এই নীতিবোধ ব্যক্তির প্রজ্ঞার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং নিঃসন্দেহে শ্রেয়তর নীতিবোধ।

1. S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*.
2. খ্রিস্টধর্মেও এভাবে পরে অ্যারিস্টটলীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রবেশ ঘটে।
3. স্বামী বিদ্যারণ্য, *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন।*

অমিতাভ বসু রায়

গ্রাহকদের প্রতি

যাদের গ্রাহক চাঁদা ডিসেম্বর 1996-এ শেষ হয়েছে তাদের কাছে অনুরোধ গ্রাহকপদ নবীকরণ করে নিন।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা 20.00 টাকা (সডাক)।

টাকা পাঠাবার ঠিকানা :

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী

P 252 লেকটাউন ব্লক A, কলকাতা 700 089

VIGNAN O VIGNANKARMI Vol XIX No. 3 July-September 1997 Rn. No. 34929/79

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, প্রযত্নে : অভিজিৎ লাহিড়ী, পি 252, লেক টাউন, ব্লক A, কলকাতা 700 089

গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন। কিছু কিছু পুরনো সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। প্রয়োজনে লিখুন।

লেখা পাঠান। সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্কের যে কোনো বিষয়ে স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান সমীক্ষা ইত্যাদি সাদরে বিবেচিত হবে।

এজেন্সি দেওয়া হয়। একসঙ্গে অন্তত পাঁচ কপি। কমিশন শতকরা পঁচিশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117 কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা 700 009 থেকে মুদ্রিত।